নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২০, পৃঃ ১৪১-১৭০
© ২০১৫ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞানে মানুষের 'উৎস' সন্ধানের মিথ

মির্জা তাসলিমা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

'নৃবিজ্ঞান মানুষের উৎস সন্ধান করে সকলকে জানাতে পারে'- নৃবিজ্ঞান প্রসঙ্গে এই ধারণাই সাধারণ মানুষের যেমন তেমনই জ্ঞানজগতের মানুষের মধ্যে বহুল পরিচিত। অথচ নৃবিজ্ঞান উৎস প্রসঙ্গে যে আলোচনা এযাবৎকাল পর্যন্ত করেছে তা নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরাই একমত হতে পারেননি। উপরন্তু ইতিহাস ঘেটে অনেকেই দেখতে পেয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার শুরুতে নৃবিজ্ঞানীরাও ভিক্টোরিয়ান সময়ে জ্ঞানজগতের সাধারণ বর্ণবাদী চর্চারই সহগ ছিল। ক্রিস্টিন বোল্টের গবেষণা দেখায়, মানুষের উৎস প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ান সময়ে জ্ঞানজগতে মানুষের উৎসের ক্ষেত্রে একসূত্রীয় বা মনোজেনেসিস ধারণা এবং বহুসূত্রীয় বা পলিজেনেসিস যে তর্ক জারি ছিল, নৃবিজ্ঞানীদের কাজও সেই তর্কের মধ্যেই কোথাও না কোথাও অবস্থিত। এই আলোচনাটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা করে এই প্রবন্ধ, ডোনা হারাওয়ে নৃবিজ্ঞানী ওয়াশবার্নের "আচরণ বিজ্ঞান" ধারণার যে সমালোচনা করেন তাও সংযুক্ত করেছে। হারাওয়ের বিশ্লেষণ আরো যুক্ত করা হয়েছে কারণ তাঁর আলোচনা আরো দেখায় জাতিসংঘের সর্বজনীন মানব ঘোষণা যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসেছে তাতে সমতাভিত্তিক সমাজের ধারণাকে নয় বরং প্রতিযোগিতামূলক মানবের ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধ এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক বিশ্বের যুদ্ধ বিগ্রহের পেছনে যে মানবের উৎকৃষ্ট- নিকৃষ্টতার ধারণার যোগসূত্র টানা সম্ভব এই যুক্তি দেয়।

পরিপ্রেক্ষিত

যে প্রেক্ষাপটে এ লেখার আগ্রহ তৈরী হলো, শুরুতেই তা খানিকটা বলে নেই- নৃবিজ্ঞান শিখতে আর শেখাতে এসে, কতবারই না শুনেছি/জেনেছি, যে নৃবিজ্ঞান পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের মানুষের উৎস রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারে, অর্থাৎ নৃবিজ্ঞান মানুষের কি জৈবিক কি সামাজিক জীবনের শুরু বা উৎস প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ। বলা হয়, নৃবিজ্ঞানীরা সরেজমিনে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গড়ন যেমন বিশ্লেষণ করে আবার তেমনি মানুষের উৎস খুঁজতে নরকঙ্কাল এবং ফসিলও বিশ্লেষণ করে, পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন অনুসন্ধান করে মানব সভ্যতার ধারাক্রমও উদঘাটন করে।

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।, ইমেইলঃ shouptik@gmail.com

তবে বিভিন্ন আলোচনা শুনে/পড়ে, চলচ্চিত্র দেখে এও জেনেছিলাম, উপনিবেশ আমল ছিল বর্ণবাদী, কে না জানে নৃবিজ্ঞানের জন্ম উপনিবেশের আঁতুড় ঘরে। এখান থেকে যে প্রশ্ন তোলা সমিচিন তা হল, উৎস অনুসন্ধানের সাথে বর্ণবাদের কোন সম্পর্ক আছে কী? খোদ নৃবিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই তো বর্ণবাদিতা ও উপনিবেশিক শাসকদেরকে সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে। এই আগ্রহ থেকে খুঁজে পেলাম, ঔপনিবেশিক যুগের ফসল, আরামকেদারার নৃবিজ্ঞানীদের বর্ণবাদী বিশ্লেষণ ও তর্ক-বিতর্ক নিয়ে ক্রিস্টিন বোল্টের ঐতিহাসিক গবেষণা কাজ, যে কাজে নৃবিজ্ঞানের ও তৎকালীন নৃবিজ্ঞানীদের বর্ণবাদী চর্চার অভিযোগের স্পষ্ট সমর্থন মেলে। অথচ আশ্চর্য হয়ে দেখি সকল পরিচিতিমূলক বইয়ে (নন্দা, ১৯৯৬; হ্যাভিল্যান্ড, ২০০০; কোটাক, ১৯৯১) উৎস প্রসঙ্গে আলোচনায় এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। এমনকি বাংলাদেশে দুই দশকের অধিক কাল ধরে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানিক চর্চায় বাংলা ভাষায় লিখিত বেশ কিছু বইয়ের ধারণাগুলো এমনঃ

> যেদিন পৃথিবীতে মানুষ প্রথম প্রশ্ন করতে শিখেছে সেদিন বোধ হয় এটাই তার প্রশ্ন ছিল যে, 'আমি কোথা থেকে এলাম? এবং কেনই বা আমি এমন একটা জীবনের অধিকারী, আর কেনই বা আমি এমনি করে আমার জীবন কাটাচ্ছি?' ------ রূপকথা, উপকথা আর ধর্মকাহিনীতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু এই উত্তরগুলো প্রমাণসিদ্ধ নয়, কাল্পনিক মানুষের কল্পনাপ্রসূত উত্তর মাত্র। মাত্র বিগত দুই শতাধিক কাল থেকে মানববিজ্ঞানের নৃবিজ্ঞানকে তিনি মানববিজ্ঞান বলছেন জন্ম, আর মানববিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হলো ঐ প্রশ্নগুলোর বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ উত্তর খুঁজে বের করা (ইসলাম, ১৯৮৫: পৃ ৫)।
>
> পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল তা কোন আদিম মানুষ লিখে রেখে যায়নি- লেখার আবিস্কার হয়েছে বহু হাজার বছর পরে। তা হলে আমাদের আদিম পূর্বপুরুষের খবর আমরা পেলাম কিভাবে? সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক এ প্রশ্নের জবাব জানেন। --- এইসব আদিম মানুষের জীবন ধারণ, সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি সম্বন্ধে যথার্থ খবর সংগ্রহ সহজ ছিল না।---তবু মানুষ জ্ঞানের সাধনায় নিরস্ত্র হয়নি। বহু নৃবিজ্ঞানীর অমানুষিক কষ্ট স্বীকার, অপূর্ব ত্যাগ এবং এমনকি কারো কারো জীবনদানের ফলে আজ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ আদিম মানুষের কথা জানতে পেরেছি (আহমেদ, ১৯৭০, পৃ ১২, ১৩)।
>
> নৃতত্ত্ব বলতে আমি মুখ্যত আদিম সমাজের আলোচনা বুঝিয়েছি। আধুনিক শিক্ষিত পোশাকী মানুষের আলোচনা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নৃতত্ত্বের নয়" (ইসলাম, ১৯৭৪)।

লক্ষ করে দেখুন বাছাই করা উদ্ধৃতিগুলোতে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ড মানব উৎস প্রসঙ্গে সঠিক উত্তর দিতে পারে বলে ধারণা দিচ্ছে। আবার নৃবিজ্ঞান আদিম সমাজ পাঠ করে এবং পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে জানাতে পারে মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, বর্তমান দুনিয়ায় এই আদিম সমাজ কোনগুলো? আর এর সাথে মানব প্রজাতির উৎসের সম্পর্কই বা কি? ঔপনিবেশিক যুগে উপনিবেশ স্থাপনকারী রাষ্ট্রগুলোর (মূলত পশ্চিমা) চোখে,এবং ঐসমাজের থেকে আসা তৎকালীন নৃবিজ্ঞানীর কাছে, উপনিবেশিত অঞ্চলের মানুষজন আদিম হিসাবে বিবেচিত ছিল। তাদের বিশ্লেষণে রাষ্ট্রহীন সমাজের

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষজনই (এস্কিমো, পিগমী, হটেনটট, সামোয়া ইত্যাদি জাতগোষ্ঠী) হলো আদিম সমাজের উদাহরণ। অন্য ভাষায় পশ্চিম বাদে বাদবাকি সকল সমাজকেই আদিম সমাজ (সেক্ষেত্রে উপনিবেশিত ভারত তথা এই বাঙালী জাতিও এর অন্তর্ভূক্ত) ভাবা হয়েছিল। ঐ ধারণা মতে পশ্চিম বা ইউরোপই হলো সভ্যতার শেষ ধাপ অপর দিকে বাকি দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজের মানুষ সভ্যতার পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধাপে রয়েছে[১]। সুতরাং অনুমান ছিল যে, এই ধরনের সমাজগুলো পঠন পাঠনের মধ্য দিয়েই (যা নৃবিজ্ঞানের কাজ) মানুষের সমাজের আদিরূপ বা উৎসরূপের কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। উল্লিখিত লেখাগুলোর কতকগুলোতে সামান্য ইঙ্গিত থাকলেও ৬০' ৭০' ও ৮০' দশকের অনেক দাপুটে নৃবিজ্ঞানীর কাজ থেকে জানা হয়েছে যে নৃবিজ্ঞানের 'আদিম সমাজ' পাঠের সাথে ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া নিজেদের সভ্য প্রমাণ করতে বিপরীতে 'অসভ্য' জাতি আবিস্কার পশ্চিমা জগতের মানুষ জনের জন্য দরকারী ছিল বলছেন কুপার (২০০৫)। ফলে কুপারের যুক্তিমতে, বর্তমান সময়ে আফ্রিকার বুশম্যানদের দেখে আদি বর্বর মানুষের সমাজ, সম্পর্ক ইত্যাদি আঁচ করা সম্ভব নয়, কারণ এইসব তথাকথিত বর্বর সমাজগুলো বর্তমান দুনিয়ায় কোন বিচ্ছিন্ন জগতে স্বতন্ত্র আদি চেহারায় জীবনযাপন করে না। এমন কি তিনি এও মনে করেন যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেও আদিম মানব সমাজের সম্পর্ক-ব্যবস্থা জানা সম্ভব নয়, যদিও তাদের ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী থেকে তাদের জীবনের কিছু কিছু জিনিষ অনুমান করা যায়। ফলে কুপার (২০০৫) মনে করেন আদিম সমাজ একটা অলীক ধারণা।

নৃবিজ্ঞানের ঔপনিবেশিক ভূমিকা সমালোচনার মুখে পড়লে, ঐ অবস্থান থেকে নৃবিজ্ঞান ক্রমেই সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। ফলে এখন নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডে, সমাজে আধিপত্যশীলতা, প্রান্তিকীকরণ এবং আধিপত্য করার প্রক্রিয়া পাঠের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে (ক্লিফোর্ড ও মারকাস ১৯৯০; মারকাস ও ফিশার ১৯৯৯; মারকাস ১৯৯৯, চৌধুরী ও আহমেদ, ২০০৩)। এসত্বেও এখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ঐ বইগুলো প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করেছি, কারণ বইগুলো বহুল পঠিত এবং নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা (বা সাম্প্রতিকতার সাপেক্ষে ভ্রম) তৈরী করতে সাহায্য করে।

যাই হোক যে কথা বলছিলাম, 'আদিম সমাজ' চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের চর্চা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে, এবং তা যে সমস্যাজনক সেটা আমরা আরো বুঝতে পারি যখন নিজেদের সমাজকে কেউ 'আদিম সমাজ' বলে, কিংবা আমাদের সমাজের সভ্যতায় পৌঁছানোর এখনও অনেক বাকি বলা হয়। বাঙালী মানব জাতি নয় বরং আলাদা প্রজাতি, অথবা মানব জাতির মধ্যে অন্য একটা উপজাতি, এরকম শ্রেণীকরণ মানতে আমরা কোনভাবে রাজী না, যদিও মনে মনে ধরে নেই আমরা প্রযুক্তিগত ভাবে পিছিয়ে থাকতে পারি কিন্তু সভ্যতায় নই। অথচ পাশাপাশি এদেশের অন্যান্য প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীকে (এথনিক) 'অসভ্য' হিসাবে বিবেচনা করতে অনেক বাঙালীর কোনই সমস্যা হয়না।

উপলব্ধির আরো নতুন যে বাঁকে এসে এ লেখার প্রবল তাগিদ বোধ করি তা হলো, ক্রিস্টিন বোল্টের লেখা পড়ার পর, 'আদিম' কথাটির বিশেষ অর্থ (পূর্বের জানা বোঝার তুলনায়) আমার কাছে ধরা পড়ে, ঔপনিবেশিকতা এবং ঔপনিবেশিক আমলাদের সাথে নেটিভদের সম্পর্কের দৃশ্যপট নিমেষে আমার দৃষ্টিসীমায় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠে। উত্তর ঔপনিবেশিক অনেক গবেষণায় জেনেছিলাম ব্রিটিশ ভারতের নীতিমালায় নেটিভদের সাথে ইংরেজদের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল (বালা, ১৯৯১)। এর পেছনের কারণ জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে অতটা স্পষ্ট ছিল না, বরং ধরে নিয়েছিলাম স্বাজাত্যভিমান হয়তো এর কারণ, কিন্তু বোল্টের লেখা পড়ে মানব প্রজাতির উৎস প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ানদের তর্ক-বিতর্ক থেকে এই স্বজাত্যভিমানের শেকড় এবং এর নিগুঢ় অর্থ অনুধাবন করতে পারি। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্য তাই বোল্টের আলোচনা উপস্থাপনার দায়িত্ব বোধ করি। তাছাড়া আরো মনে করি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সম্পর্কে এই ইতিহাস এখনও প্রাসঙ্গিক। এজন্য এখানে প্রথমে ক্রিস্টিন বোল্টের (১৯৭১) লেখা *Victorian Attidudes to Race* থেকে নরবর্ণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর মধ্যে তর্ক বিতর্ক প্রসঙ্গে আলোচনাটির সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি এবং প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় রাজ্যের মানুষ সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গিও আলোচনা করেছি। আর পরের অংশে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসের সাহায্য নিয়ে পরবর্তীতে মানব উৎস ও তার সাথে বিভিন্ন জাতের মানুষের শ্রেণীকরণের সম্পর্ক স্পষ্ট করার প্রয়াস রয়েছে। এক্ষেত্রে একাধারে নারীবাদী নৃবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানী ডোনা হারাওয়ের কাজ/বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তিনি ওয়াশবার্নের "আচরণ বিজ্ঞান" প্রজেক্টের একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন, সাথে প্রাসঙ্গিক জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানব ঘোষণার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও তার কাছ থেকে আমরা পাই। তাঁর এই আলোচনাও এখানে যুক্ত করছি।

তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও ভিক্টোরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি

ঔপনিবেশিক যুগে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিক্টোরিয়ানদের বিশ্বাস খুব দৃঢ় ছিল, এই প্রেক্ষাপটে নরগোষ্ঠী সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল সেই আলোচনা করেছেন ক্রিস্টিন বোল্ট। তিনি বলেন, মানব পাঠের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠের আগ্রহই জোড়ালো ছিল। এসময় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং জার্নাল প্রকাশিত হয়। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্নজাতের মানুষ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হতে থাকে, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ থাকার কারণে, উপনিবেশিত রাজ্যগুলোর নরবর্ণ সম্পর্কে জানা ও বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরী ভাবা হয়েছিল। বোল্ট দেখান এর পেছনে দুটো যুক্তি কাজ করেছে, এক: মনে করা হত ঔপনিবেশিক অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসকদের এক নরবর্ণের জন্য প্রস্তুতকৃত আইন অন্য নরবর্ণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঠিক নয়, এছাড়া দুই: আরো ভাবা হত মানব জাতি সম্পর্কে পাঠ- তার শ্রেণীকরণ করা সভ্য সমাজের সদস্য হিসাবে

নৃবিজ্ঞানীর জন্য মহান দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা উচিৎ। এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে এখানে Galton এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন বোল্ট,

> "the English do not excel in winning the hearts of other nations. They have to broaden their sympathies by the study of mankind as they are, and without prejudice" (গাল্টন, ১৮৮৫, উদ্ধৃত করেছেন বোল্ট, ১৯৭১ পৃ. ৫)

অর্থাৎ ব্রিটিশরা নিজেদের অপরাঅপর জাতি গোষ্ঠির চাইতে উন্নততর ও সভ্য ধরে নিয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানব জাতি বিশ্লেষণের দায়িত্বও নিজেদের কাঁধে নিয়েছে। একই কারণে এসময় ব্রিটিশ প্রশাসকদের ব্যাপারে অভিযোগ উঠে যে তারা মিশনারীদের মাধ্যমে এই 'বর্বর' নরবর্ণের মানুষগুলোকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে মনোযোগী ছিল না- কেবলমাত্র ব্রিটিশ চার্চই খ্রীস্ট ধর্ম বিস্তারের মাধ্যমে একাজটি করার চেষ্টা করেছে। অথচ প্রশাসকদের অমনোযোগিতার জন্য আফ্রিকাতে খ্রীস্ট ধর্ম সফল হয়নি, কারণ সেখানে খ্রীস্টধর্মের সাথে যায় না এমন কিছু বিষয় আফ্রিকানদের চিন্তা ভাবনা দখল করেছিল। ভাবা হত, 'নিগ্রো'দের খ্রীস্টদের (সভ্যদের) সমতুল্য কোন ধর্ম নেই,তাদের দয়া মায়া নেই, এমন কি আরো ভাবা হত, পিতার ভালবাসা কিংবা দাম্পত্য প্রেমের ধারণাও সেখানে নেই। অন্যদিকে এও মনে করা হয়, ইসলাম ধর্ম আফ্রিকানদের বিশ্বাস জয় করতে পেরেছিল কারণ এরা আফ্রিকানদের বিশ্বাসগুলো উৎপাটন করার চাইতে সেগুলো গ্রহণ এবং সংরক্ষণ করেছিল। অর্থাৎ আফ্রিকাতে ইসলাম ধর্মও সমান 'বর্বর' হয়ে উঠেছিল। এই বিশ্লেষণকারীদের যুক্তি ছিল খ্রীস্টান মিশনারীদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গিয়ে তাদেরকে বদল করা উচিৎ, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মতে সভ্যতার বিচারে মুসলিম বিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান স্বার্থকতার সাথে ইসলাম ধর্মের আত্মিক উৎকৃষ্টতার কোন সম্পর্ক নেই। ভাবা হত. কেবলমাত্র যুৎসই কৌশলের অভাবের কারণ ব্রিটিশ প্রশাসকেরা এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। বলা বাহুল্য ব্রিটিশ জাতি যেমন উন্নততর তেমনি খ্রীস্ট ধর্মও উৎকৃষ্ট- তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসই কেন্দ্রে ছিল। ভারতীয় রাজ্যের মানুষজনদের প্রতি ভিক্টোরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে বলা প্রয়োজন, ঐসময় নৃবিজ্ঞানে মানব উৎস প্রসঙ্গে আলোচনায়, ভিক্টোরিয়ানদের মধ্যে যে তর্কবিতর্কগুলো চলমান ছিল, সেগুলোও প্রাসঙ্গিক ছিল।

উৎস প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ান যুগে প্রধান দুই তর্ক

ক্রিস্টিন বোল্টের আলোচনায় পাওয়া যায়, ভিক্টোরিয়ান যুগে নৃবিজ্ঞান মানুষের বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হলেও তার পাঠ-পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে মতানৈক্য ছিল, ফলে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, যেমন ভাষা এবং দৈহিক অবয়ব উভয়ই ব্যাখ্যার সাহায্যে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বিভাজনকে বুঝতে চাওয়া হত। এক্ষেত্রে নরবর্ণ বা race কে দেহ ও আত্মা, মানুষ ও জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক মনে করা হত। অন্য

কথায় নরবর্ণের ধারণা জৈব-বৈজ্ঞানিক ধারণার বেশীকিছু হয়ে উঠে- মানে দেখা যায়, নরবর্ণের সাথে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে আবশ্যিকভাবে যুক্ত করে একধরনের বিপদজনক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলতে থাকে। এই সময় তর্কবিতর্কের মধ্যে সকলে একমত ছিলেন যে নরবর্ণগত পার্থক্য জৈবিক ভিন্নতার কারণে হয়, কিন্তু মূল তর্ক ছিল উৎস্য প্রসঙ্গে। যার স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন গাত্রবর্ণের মানুষের সক্ষমতাকে বিচার করবার ক্ষেত্রে। দুরকম ধারণা দেখা যায়, মনোজেনেসিস- যারা খ্রীস্ট ধর্মের বর্ণিত উৎস্য রহস্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন, যেখানে বলা হয় সকল বর্ণের মানুষ একই উৎস্য থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে উৎপত্তি হয়েছে। এরা আরো মনে করে সকল বর্ণের মানুষই পরস্পরের সাথে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে মানব প্রজাতি উৎপাদনে সক্ষম। অপর দিকে ছিল, পলিজেনেসিস- যারা মানুষের নানান উৎসে বিশ্বাস করে। এক এক গাত্রবর্ণের মানুষের উৎস আলাদা মনে করা হত। ষোল শতক থেকে মূলত আমেরিকা, ফ্রান্স, এবং ইংল্যান্ডে এই ধারণা শক্তিশালী হতে থাকে। যারা মনে করে আন্তবর্ণের মধ্যে উর্বরতা নেই, এই ধারণা সমসাময়িক কালের প্রশ্নহীনভাবে গৃহীত হাইব্রিড প্রসঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে। এরা বিশ্বাস করে আন্তবর্ণের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হতে পারে না, হলেও যে প্রজন্ম আসবে তাতে উন্নত বর্ণ অধঃগামী হবে বা গুণাবলী হারাবে, আজব প্রাণী উৎপন্ন হবে যারা মানব নয়, ফলে পৃথিবীর কোন কাজে আসবে না (বোল্ট: ১৯৭১, পৃ ৯, ১০)। এই মতাদর্শের অনুসারী ফ্রেঞ্চ বর্নবাদী ডি গবিনিউ বলেন, "হাইব্রিডরা হতে পরে সুন্দর কিন্তু শক্তিমত্তাহীন, শক্তিশালী কিন্তু বুদ্ধিহীন, অথবা বুদ্ধি থাকলেও দুর্বল এবং কদাকার" (গবিনিউ, ১৯১৫, পৃ ২০৯ উদ্ধৃত বোল্ট, ১৯৭১, পৃ ১০)।

প্রসঙ্গক্রমে বোল্ট (১৯৭১) এ থেকে আরো দেখিয়েছেন, চার্লস ডারউইনের সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজ তার প্রথম বই *Origin of Species,* ১৮৫৯ সালে প্রকাশের বার বছর পর, *Descent of man* প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে এই বিবর্তনের ধারণাটির অন্যান্য জ্ঞানকান্ড, যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, এবং প্রাণবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রাণবিজ্ঞানে প্রথম ল্যামার্ক ১৮০৯ সালে দেখান যে, পৃথিবীর প্রাণীজগত পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা সিরিজ তৈরী করে, যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে চেইনের মত এককোষী আদি জীব থেকে মানুষের উৎপত্তি। ব্রিটেনে রবার্ট চেম্বার এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের লেখায় ডারউইনের তত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কে আশাবাদ লক্ষ করা যায়। এদিকে ডারউইন তার *Origin of Species* এ কেবল মানব প্রজাতির উৎস প্রসঙ্গে অনুসন্ধানের সম্ভাবনার সঙ্কেত দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বইতে উল্লেখ করেছেন তার ধারণার বিপরীতে তিনি কোন পূর্ব অনুমান করতে চাননি। কিন্তু দ্বিতীয় বই প্রকাশের আগেই স্পেন্সার সহ অন্যান্যরা এধারণার ভিত্তিতে কাজ করে ফেলেন। এর ফলে ডারউইনও তার *Descent of man* এ এই ধারণার প্রায়োগিকতাকে স্বীকার করে নেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন কেন্দ্রিক মতবাদে (ম্যালথাসের জনসংখ্যার ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত) মনে করা হয় মানুষের সার্বক্ষণিক বৃদ্ধি ঘটছে এবং টিকে থাকার জন্য তারা লড়াই করে, প্রত্যেক প্রজন্মের যোগ্যতমরাই সেখানে টিকে থাকে। ওয়াইজম্যান এই মতবাদকে

এগিয়ে নিয়ে বলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনই জৈবিক বিবর্তনের একমাত্র কারণ এবং এখানে একমাত্র জন্মগতভাবে প্রাপ্ত সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোই পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। ডারউইন তার মানব বিবর্তনে যৌনতার নির্বাচনবাদের উপর গুরুত্ব দেন। ধর্মকে আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য ডারউইনের না থাকলেও তার আলোচনা মনোজেনেসিসদের অবস্থানের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। স্পেন্সার যেভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাকে জনপ্রিয় করেন, তাতে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম রয়েছে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্রিটেনে পলিজেনেসিসরা অস্থায়ীভাবে সফল হয়। পলিজেনিসিস ধারণার সাফল্যের অন্য মানে হল ব্রিটিশ ও ইউওরাপীয়রাই শ্রেষ্ঠ জাত বা সভ্য বা এমন কি একমাত্র মানব জাতি, আর এর বাইরে অন্যান্য জাত নিকৃষ্ট বা অন্যান্য গোষ্ঠী এমনও মানব জাতই হয়ে উঠেনি।

এই আলোচনা পড়ে দেখা যায়, উৎস প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ানদের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে মোনেজেনেসিস ও পলিজেনেসিস বিতর্ক চলেছে। ক্ষেত্রগুলো হল ভাষার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে ভাষার উৎস রহস্য, মস্তিষ্কের আকৃতির এবং চোয়ালের কাঠামোর ভিত্তিতে মানব জাতির আদিরূপ অনুসন্ধান, আর রয়েছে গাত্রবর্ণের বিচার। সকল ক্ষেত্রেই দেখছি, ইউরোপীয়দের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার আগ্রহই ছিল মূল।

তর্ক : ভাষা কেন্দ্রিক

ভাষার ক্ষেত্রে মনোজেনেসিস ধারণার পেছনে উল্লিখিত উনিশ শতকের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

অন্যদিকে যেহেতু পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা রয়েছে, ফলে মানুষের বহুবর্ণ থেকে উৎপত্তির যুক্তিকে সমর্থন করা সহজ হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের মনোজেনেসিস্টরা তিনটি মূল ভাষা থেকে পৃথিবীর সকল ভাষার উৎপত্তি বলে মনে করেছেন, এগুলো হলো ইউরোপিয়ান (আর্য), সেমেটিক এবং মালায়। এখানে উৎস ভাষা একটি নয় বরং তিনটি। এই বিশ্বাসের উপর উনিশ শতকের শুরুতে বিবর্তনবাদীদের প্রভাব পড়তে থাকে। এরপর পূর্বেই উল্লিখিত ডারউইনবাদের জনপ্রিয়তার জন্য ব্রিটেনে মানুষের মধ্যে পলিজেনেসিস দর্শন জনপ্রিয়তা লাভ করে, যদিও তা স্বল্পস্থায়ী ছিল। ভাষার বিভিন্নতা প্রসঙ্গে পুরনো বিতর্ক নতুন করে শুরু হয়। সেইস, টাইলর প্রমুখ ভাষার ভিন্নতার সাথে নরবর্ণের পার্থক্যকে এক করে দেখার ব্যাপারে আপত্তি করেন, তবে তারা ইউরোপীয় ভাষার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন। যেমন সায়াক বলছেন- "আধুনিক বর্বরদের ভাষাকে অন্যান্য ভাষার সাপেক্ষে শ্রেণীকরণ করলে খুব সীমিত পরিসরের মনে হবে", "[তাদের] খুব কম শব্দ আছে, কারণ তাদের খুব কম মনোভাব রয়েছে, যা প্রকাশ করতে হয়, এবং তাদের যে ভাবগুলো প্রকাশ করতে হয় সেগুলো অভিনব ভাবে সরল" (সেইস, ১৮৮০, উদ্ধৃত বোল্ট, ১৯৭১, পৃ ১১) তবে ল্যাথাম[২] ও মুলারদের[৩] মত তাত্ত্বিকরা বিবর্তনবাদী ধারণায় বিশ্বাস করতেন, ফলে তারা ভাষার ভিন্নতার ভিত্তিতে যে শ্রেণীকরণ করেন, সেখানে ভাষাগুলো বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে বলে দেখান। এসময় পলিজেনেসিস বনাম পুরনো আর্য শ্রেষ্ঠত্বের বিতর্ক জোরে সোরে

শুরু হয়। ল্যাথাম যখন *Encyclopedia Britannica* র জন্য ১৮৫৫ সালে এথনোলজির অবদানের কথা লেখেন, তখন তিনি মনোজেনেসিসে বিশ্বাসী (বিশেষ করে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার একটা সাধারণ উৎস আছে) হওয়া সত্ত্বেও মনে করেন যে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ আছে– এই তর্ক থাকা ভাল। এনসাইক্লোপিডিয়ার নবম খন্ড বিশ্বসাহিত্যে প্রকাশিত হয়, তখন এলি রিকলাস বলেন, যখন ফিলোজেনেসিস্টরা পলিজেনেসিস্ট অবস্থান থেকে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার উপস্থিতির কথা বলেন তখন এথনোলজিস্টদের দেখতে পাওয়া উচিৎ যে, এই পার্থক্য ধরনে নয়, গুণ ও মানে। এছাড়া অনেকেই আরো বলেন যে পৃথিবীতে ১০০০ টি ভাষা রয়েছে (যদিও মনে করা হয়, এগুলোর উৎস ভাষা ১০০টি)। ভাষা যদি জাতিগত ভিন্নতার ভিত্তি হয়, তার মানে দাঁড়ায়, এতগুলো আলাদা জাতি রয়েছে, এরকম অসম্ভব ধারণা করা ঠিক নয়।

বোল্ট দেখছেন যে, বর্ণবাদীরাও ভাষার শ্রেণীকরণ নিয়ে খুশী হতে পারেনি কারণ ভাষাগত যোগাযোগের দিক দিয়ে দেখলে, হান্ট দেখতে পান ওয়েস্ট ইন্ডিজদেরকে নিগ্রোদের সাথে নয় ইউরোপীয়দের দলভূক্ত করতে হবে। তার মতে এইজন্য দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিন্নতাকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। একই কারণে জন ক্রাউফোর্ড আর্য ভাষা কেন্দ্রীক ধারণার সমালোচনা করেন। অপরদিকে আর্য ভাষা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতর ভাষা এমনটা ভাবা হয়। আর ভাবা হয় আর্য ভাষা, আর্য বর্ণকেও নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে ফরাসী, ব্রিটিশ ও জার্মানদের জন্য দাবী করা সম্ভব হয় যে তারাই আসল আর্য উত্তরাধিকার। এধরনের মত অনুযায়ী, ভাষাগত এই বিশাল ফারাক বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্যকে নিশ্চিত করেছে। যেমন ধরা হয় 'নিগ্রো'দের কোন বর্নমালা নেই, এবং তারা অন্য কোন জাতির কাছ থেকে বর্ণ ধার করতেও পারে না। অন্যদিকে ফারার এর মতে আর্য জাতি বিজ্ঞান ও শিল্পের সকল ভাল কিছু সৃষ্টি করেছে। এমনকি লেখা আবিষ্কার করেছে। তিনি আরও মনে করেন, আফ্রিকান ভাষা এত নিম্ন মানের যে তাদের লেখ্যরূপও নেই, ইউরোপীয়দের পর্যায়ের শিল্পসংস্কৃতি নেই। সংখ্যা নির্দেশক বা বিমূর্ততাকে নির্দেশ করে এমন কিছু নেই। এ'থেকে এরা যে ইউরোপীদের তুলনায় নিম্নমানের তা তারা নিশ্চিত হন। কিন্তু পরবর্তীতে অনেকে লক্ষ করেন যে নেটিভ ভাষার মধ্যে পরিবর্তনশীলতা রয়েছে, ফলে ঐ নেটিভ ভাষাগুলোকে নিম্নমানের বলা কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া অনেকে নেটিভ ভাষা বুঝতে যেয়ে নেটিভদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি নুতন করে প্রশংসা করতে বাধ্য হন এবং দেখেন যে আফ্রিকান (বা অন্য জাতের মানুষেরা) রা অন্যদের ভাষাও শিখতে পারে। অর্থাৎ পূর্বতন ভাষাভিত্তিক জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের শর্তগুলো আর কাজ করে না। এতে যা দাঁড়ায় তা হলো ভাষাকে কেন্দ্র করে এধরনের তর্ক বিতর্কগুলো অসাড় প্রমাণিত হতে থাকে।

তর্ক: মাথার খুলি মাপজোক সংক্রান্ত

ভিক্টোরিয়ান নরবর্ণ নির্ভর অন্য আর একটি ধারণার ভিত্তিতে মানুষের মাথার খুলি মাপজোকের মাধ্যমে মানুষের বিবর্তনের শ্রেণীকরণ করা হত। এই মাপজোককে

ক্রানিওমেট্রি বলা হয়। এক্ষেত্রে মাথার খুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ, মুখাবয়ব, খুলির অভ্যন্তরে ধারণ ক্ষমতা, বিশেষ করে মগজের ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে আমেরিকার ফ্রেনোলজিস্টরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে 'নিগ্রো'দের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ককেশয়েডদের (ইউরোপীয়) তুলনায় কম, তার মানে তাদের বুদ্ধিমত্তাও কম। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত পর্যাপ্ত খুলি পরীক্ষা না করে এবং মাপজোকের সাধারণ কোন নিয়ম অনুসরণ করে করা হয়নি বলে, ব্যাপক প্রশ্নের মধ্যে পড়ে। তা সত্ত্বেও জেমস হান্ট, পূর্বতন পদ্ধতির অনুসারী, গ্র্যাটিউল্যাট এর বিশ্লেষিত খুলির ধরনের ভিত্তিতে তিন ধরনের মানব প্রজাতির ধারণাকে স্বীকার করে নিতে চান, এগুলো হচ্ছে, ফ্রন্টাল (ইউরোপিয়ান), পেরাইটাল (মঙ্গল), এবং অক্সিপিটাল (নিগ্রো) নরবর্ণ- এই ক্রানিয়াল পার্থক্যের সাথে মানসিক এবং নৈতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য যুক্ত করা হয়, যা কেবলমাত্র দৈহিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বলে তিনি মনে করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নিগ্রোদের মস্তিষ্ক (যা ইউরোপীয় নারী ও শিশুদের মত) লেজহীন বানরদের (ape) দের কাছাকাছি। যদিও হান্ট মনে করেন না যে মস্তিষ্কের আকার বুদ্ধিমত্তার একমাত্র নিয়ামক। সম্প্রতি যখন দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপীয়ানদের তুলনায় জাপানিজ, আমেরিকান ইন্ডিয়ান, এস্কিমো এবং পলিনেশিয়ানদের মস্তিষ্ক বড়, তখন এই যুক্তি বর্ণবাদীদের কাছে তার আবেদন হারিয়ে ফেলে। অনেকেই মুখাবয়ব ও চোয়ালের আকৃতির ভিত্তিতেও বিভিন্ন নরবর্ণের সমাজের বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতি এবং নৈতিকতার পার্থক্য হয় বলছেন। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় জাতিগুলোরই সুগঠিত মুখাবয়ব ও চোয়াল আছে বলে দেখান হয়, অপর পক্ষে আফ্রিকান ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখাবয়ব ও চোয়ালের গঠন নিকৃষ্ট সংস্কৃতি, বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিকতাকে নির্দেশ করে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী, উডওয়ার্থ এই ধারণাকে স্বীকার করে নেন যে, ব্যক্তি ব্যক্তিতে মস্কিষ্কের সেন্সুরী এবং মটর প্রক্রিয়ায় পার্থক্য হলেও বিভিন্ন নরবর্ণের মধ্যে এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য হয় না, সব একই। এছাড়া বোল্ট দেখছেন, ক্রানিওমেট্রি শুধু অশুদ্ধতার ধারণার জন্য বাতিল হয় তা নয় বরং এরা ইন্দো- ইউরোপীয়ান নরবর্ণগুলোকে একই দলভূক্ত করে বলেও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। কারণ ক্রাউফোর্ড অভিযোগ করেন মস্তিষ্কের আকার বিবেচনা করলে হিন্দু এবং ইউরোপীয়দের একই কাতারে বিবেচনা করা যাবে, অথচ তিনি বিশ্বাস করতে চাইতেন যে হিন্দুরা ইউরোপীয়দের চাইতে নিকৃষ্ট তো বটেই, এমন কি এরা মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন নরবর্ণের চাইতেও নিকৃষ্ট।

ভাষা এবং খুলির মাপজোকই বিভিন্ন নরগোষ্ঠীকে বিশ্লেষণ আগের নৃবিজ্ঞানীদের একমাত্র বিবেচ্য ছিল না। এক্ষেত্রে শুরুর দিকের শ্রেণীকরণবিদ বার্নিয়ার, লিনিয়াস ও বন্টু মেনবাক গাত্রবর্ণকে বিবেচনায় নিয়েছিলেন, যদিও বর্তমানে গাত্রবর্ণকে বৈজ্ঞানিক মহলে নরবর্ণ পৃথকীকরণের জন্য বিবেচনা করা হয় না, তবে উনিশ শতকেই 'বর্ণবাদ' এর একটা সাধারণ অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

তর্ক: গাত্রবর্ণ কেন্দ্রিক

আমরিকান 'নিগ্রো' উইলিয়াম ক্রাফট ১৮৬৩ তে লন্ডন নৃবৈজ্ঞানিক সমাজের সভায় বলেন যে, দৈহিক বৈশিষ্ট্য আসলে আবহাওয়ার তারতম্যের ফলাফল, এর সাথে মানুষের অন্তর্গত উচ্চমান বা নিম্নমানের কোন সম্পর্ক নেই। এই মতের সাথে ক্রাউফোর্ড দ্বিমত পোষণ করে বলেন- ইউরোপীয়রা যে কোন আবহওয়ায় থাকতে পারে, এমন কি প্রচন্ড গরমে থাকলেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে গাছপালা ও জীবজন্তুর অভাব, সাথে অনুর্বতা ও নিঃসঙ্গ আবহাওয়া, নিউজিল্যান্ড ও আদি অস্ট্রেলিয়ানদের পিছিয়ে পড়াকে ব্যাখ্যা করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। একইরকমভাবে ইউরোপের উন্নত মানের ভৌগলিক অবস্থা দিয়ে ইউরোপের উন্নতমানের নরগোষ্ঠীকে ব্যাখ্যা করে অনেক ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানীই সুইস ও ক্যুইভারের তিন ধরনের শ্রেণীকরণ বা বন্টু মেনবাকের পাঁচ ধরনের শ্রেণীকরণকে মেনে নেন। ক্যুইভারের অনুসরণে ১৮৬৭ সালে ন্যাপিয়ার তিন ধরনের নরবর্ণের কথা বলেন, সেগুলো হলো-নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগপ্রবণ। ইন্দো-ইউরোপীয়রা হলো নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত, এবং আবেগপ্রবণতাই তাদের শক্তি, অন্যদিকে আবেগপ্রবণ পরিবার দেখা যায় মঙ্গোলিয়ান এবং ইথিওপিয়ানদের মধ্যে। ন্যাপিয়ারের বিশ্লেষণে স্পষ্টতঃই ইউরোপীয় বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়।

ক্যুইভারের ধারণার সাথে কিছু ভিন্ন মত করলেও অন্য দুজন ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ফ্লাউয়ার ও ডালাসও একই ধরনের ধারণা দেন। ১৮৫০ ও ১৮৬০ এর দিকে পুরনো পলিজেনেসিস ও মনোজেনেসিস বিতর্ক পুনরায় শুরু হয়। নক্স ও হান্ট শক্তপোক্তভাবে পলিজেনেসিস তর্ক সামনে নিয়ে আসেন। নক্স, গবিনিউ এর মত খাঁটিত্বের বিরোধিতা করেন, হান্ট অবশ্য বিশেষভাবে 'নিগ্রো'দের অবস্থান নিয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৬ এর মধ্যে লন্ডন নৃবৈজ্ঞানিক সমাজ (London Anthropological Society) ও ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে, হান্ট, স্থায়ী হাইব্রিড ইউরো-আফ্রিকানদের উপস্থিতির ধারণার বিরোধিতা করেন, কারণ তিনি মনে করতেন 'নিগ্রো'রা মানব জাতির অন্য একটি প্রজাতি। অনেকেই এই ধারণাকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে কার্টার ও ডিঙ্গেল ১৮৬৪ তে বলেন, এই পলিজেনেসিসের ধারণা শতবছর ধরে চূড়ান্ত নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতাকে টিকিয়ে রাখতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অনেকেই আবার হাইব্রিডিটির ধারণাকে ঠিক ভেবেছিলেন বলে মানব জাতির একত্বের ধারণার বিরোধীতা করেছে। এছাড়া, হান্টের ধারণার বিরোধিতাকারীরাও ছিলেন- যেমন রবার্ট ডান মনে করেন, সকল মানুষের একই জীবজগতের বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রকৃতি রয়েছে।

১৮৬৯ সালে লন্ডনের নৃবৈজ্ঞানিক সমাজের রিপোর্টে দেখা যায় পলিজেনেসিসদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়ে বিবর্তনবাদীদের জায়গা তৈরী হচ্ছে। উনিশ শতকে নিউজিল্যান্ড, হাওয়াই, তাসমানিয়া, আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের জনসংখ্যা হ্রাস হওয়াকে ডারউইনিজম দিয়ে ব্যাখ্যা করা হতে থাকে।

এক্ষেত্রে যোগ্যতমের জয়ের ধারণা দিয়ে মনে করা হয় যে প্রমাণিত হয়েছে- সভ্য এবং অসভ্য জাতির মিশ্রণ হতে পারে না- হলেও অসভ্য জাতিগুলো এই দ্বন্দ্বের ফলাফলে সংখ্যার দিক দিয়ে কমে যেতে থাকবে। ১৮৯০ এর দিকে এই ধারণা খুব জোরালো হতে থাকে, ফ্রেরে Anthropological Institute এর জার্নালে বলেন এস্সেরিয়া, মিশর, রোম ও ব্রিটেনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠরা নিকৃষ্টদের জয় করে নিয়েছে। তবে তিনি আরো বলেন, একইসাথে দেখা যায়, আদিবাসী বর্ণের ভাগ্যে সবসময় একই ঘটনা ঘটে না, সকলসময় তাদের সংখ্যা হ্রাস ঘটে না। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বেকনাস ও বুশম্যানরা সংখ্যার দিক দিয়ে ভোগান্তির শিকার হলেও 'কাফির' বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং শ্বেতাঙ্গদের সংস্পর্শে এসে আকৃতির উন্নতি ঘটেছিল, বিশেষ করে শিক্ষায় তাদের বিশেষ উন্নতি ঘটে।

এই ধরনের বর্ণ নির্ভর আলোচনাতেও ক্রিস্টিন বোল্ট একধরনের 'আতঙ্ক' কাজ করে দেখতে পান। ভিক্টোরিয়ানরা আশঙ্কা করতে থাকে যে, এই ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বেও মধ্যে হয়তো উপনিবেশিতরা পাল্টা আক্রমণ করবে না; কিন্তু, সকল সময় কি জয় শ্রেষ্ঠদেরই হবে? অনেকেই মনে করেন বর্বররা ধীরে ধীরে জয়ীদের উপর প্রতিশোধ নেবে। যেমন রবার্ট নক্স বলেন ইউরোপীয়ানরা ইউরোপেই উন্নতি করবে, আর উপনিবেশ টিকিয়ে রাখতে ইউরোপীয়দের সবসময়ই স্থায়ী সামরিকশক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। এদিকে বিভিন্ন নরবর্ণের মধ্যে মিশ্রণের পক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছিলেন, তারা খুব সমলোচিত হন, কারণ এদের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে এরা. শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণঙ্গের সাথে যৌন সর্ম্পকের ফলে মনুষ্য প্রজাতির যে সংখ্যা হ্রাস ঘটবে এবং যে নিম্নমানের মানব সৃষ্টি হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখেনি। যেমন ক্রাউফোর্ড বলেন আরব ও 'নিগ্রো' দের মিশ্রণে 'নিগ্রো' নরবর্ণের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু অ্যাঙ্গলোসেক্সনরা কোনভাবেই 'নিগ্রো' দের সাথে মিশ্রিত হতে পারবে না, কারণ দুটো বর্ণের মধ্যে দূরত্ব অনেক। তবে ডান মনে করেন আন্তবর্ণের মিলনে অপেক্ষাকৃত বর্বররা লাভবান হয়।

অর্থাৎ বোল্টের আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি, ভাষা বা ক্রানিওমেট্রি ছাড়াও গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল বলা হত এবং এক্ষেত্রে মনে করা হত ইউরোপীয়রা যোগ্যতর বলেই উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ও উপনিবেশিতদের শাসন করে কিংবা অগ্রসর জায়গা থেকে হেদায়েত করছিল। কিন্তু তা সত্বেও বোল্ট দেখতে পান যে ভিক্টোরিয়ানদের মধ্যে স্বস্তি ছিল না, সবসময়ই তাদের মধ্যে এই বিজয়ী অবস্থান হারানোর আতঙ্ক দেখা যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও এর পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়।

ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও পরাজিত হওয়ার আতঙ্ক

১৮৯৩ সালে থমাস হাক্সলি (উদ্ধৃত করেছেন বোল্ট, ১৯৭১, পৃ ২৪) তার বিখ্যাত রোমানেস লেকচার Evolution and Ethics এ বলেন যে, "সকল ক্ষেত্রে, সকল মূহুর্তে বিশ্বব্রহ্মান্ডের যা চলছে তা হলো, পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে এক

রূপান্তরকালীন খাপ খাইয়ে নেওয়া- বিরোধপূর্ণ একটা অবস্থা- যেখানে প্রতিযোগীদের পরস্পরের মধ্যে সুযোগ ঘুরে ঘুরে আসে।" হাক্সলি আরও মনে করেন, মানুষ বর্বরতা থেকে অগ্রসর হয়েছে জীবজন্তুর মতই দৈহিক শক্তি, চতুরতা, সামাজিক অনুসন্ধিৎসা, অনুকরণপ্রিয়তার সাহয্যে। কিন্তু মানুষ যত সভ্য হয়, তত, এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে লজ্জাজনক, তা প্রমাণ হয়। হাক্সলি তাই উন্নতির অনিবার্যতার ধারণার সমালোচনা করেন, যাতে যোগ্যতমের জয়ের ধারণাকে জায়গা দেওয়া হয়। তিনি বলেন, কে যোগ্যতম তা নির্ভর করে অবস্থার উপর, অথবা এক্ষেত্রে হয়তো নৈতিক মানে শ্রেষ্ঠত্বের চাইতে 'দৈহিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী'কে বোঝানো হয়। পৃথিবীর আনন্দ বেদনা বন্টিত থাকে যোগ্যতা অনুযায়ী। বর্বরতাকে আধুনিক মানুষের মধ্যে ছদ্মাবরণে রাখার মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষ এবং সমাজ সফল হয়।

আর এসময় অন্যরা আরো বলেন, উন্নতি বা অগ্রসর হওয়ার ধারণা খুবই আধুনিক এবং পাশ্চাত্যের। মেইন যেমন দেখাচ্ছেন, মুসলিম সমাজ এই অগ্রসরের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আরো দেখা যাচ্ছে, আফ্রিকার মানুষ এটা পছন্দ করে না, চাইনিজ সাম্রাজ্যও অগ্রসরের ধারণাকে চায় না। উন্নতি বা অগ্রসরমানতা কেবল পশ্চিমে শুরু হয়েছে, যার সাথে বাণিজ্য ও সম্পদের বিস্তার, নতুন যন্ত্রপাতির আবিস্কার, এবং পৃথিবীতে নতুন সম্পদের আবিস্কার সম্পর্কিত। এটা যেহেতু শিক্ষার সাথে যুক্ত তাই এর সফলতা কেবল আংশিক হতে পারে, এবং তাই 'বর্বর' নরবর্ণের মানুষজন শুধু যে এধারণার বিরোধীতাই করে তাই নয়, এর সাথে যুক্তও হতে পারে না।

ভিক্টোরিয়ান যুগের নৃবিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আদিম মানব যে নিকৃষ্ট, সে ব্যপারে বিশেষভাবে একমত ছিলেন। হ্যাডন বলেন, নরবর্ণের মধ্যে মিশ্রণ, তা বাণিজ্য অভিবাসন বা যুদ্ধের মাধ্যমে যেভাবেই হোক না কেন, পরিবর্তনের জন্য খুবই জরুরী। এই ধারণা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও সমর্থন করেছিলেন। আধুনিক সময়ে প্রাচীন বিশ্বাসগুলো যে টিকে আছে, তা টাইলর সহ বেশ ক'জন নৃবিজ্ঞানী মনে করেছিলেন, যদিও তারা এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, আধুনিক আদিম মানুষজন উচ্চতর সভ্যতার বংশধর। যেমন টাইলর ও লুব্বক, উন্নতির ধারণা এমনভাবে বিশ্বাস করতেন যে সেখানে স্যাভেজ ও বারবারের অর্থ হলো এমন আচরণ, যা বন্য, রুক্ষ ও নিষ্ঠুর। তাঁরা মনে করতেন, বর্বর ট্রাইবগুলো সংস্কৃতির যে স্তরে রয়েছে, ইউরোপীয় পূর্বপুরুষেরা অনেক আগেই তা পার হয়ে এসেছে। কিন্তু এরিগেইল এবং ডারবিনের আর্চবিশপ হোয়েটলি বর্তমান সময়ের বর্বরদের আনুষ্ঠানিকতা রীতি নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা দেন। হোয়েটলি মনে করেন মানুষ বর্বর অবস্থা থেকে আসেনি। তিনি বিভিন্ন সমাজের মানুষের সভ্য বা আদিম হওয়ার কারণ হিসাবে সভ্যদের উন্নতিকে মনে করছেন না। বরং আদিমদের অবনতিই এর জন্য দায়ী। লুব্বক এই ধারণাকে সম্পূর্ণ খারিজ করে বৈজ্ঞানিক স্বরে বলেন, অবনতি হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যেতে পারে কিন্তু এটা সমগ্র

নরবর্ণের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না। লুব্বকের দাবি, এরিগেইল নিজে খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন বলে মনোজেনেসি বিশ্বাসী ছিলেন ফলে মানুষ বর্বর দশা থেকে এসেছে এবং বিভিন্ন সমাজের মানুষ বিবর্তনের এক এক দশায় আছে, এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বোল্ট (প্বাগুক্ত) বলছেন ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানে বিবর্তনবাদী ধারণা বিপদজনকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মাধ্যমে ভিক্টোরিয়ানরা হালে পানি পেয়েছিল। অগ্রসর বা উন্নতির ধারণা ব্রিটিশ চিন্তকদের জন্য দরকার ছিল, কারণ তারা মনে করেছিল সভ্য সমাজে অসভ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু উন্নতি দিয়ে তা দূর করতে হবে। এর ফলে তারা সাংস্কৃতিক ক্রমচোস্তরতার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পেয়েছিল, যাতে পশ্চিমা সভ্যতা সর্বোচ্চ জায়গা পায়, এর পরে আছে পূর্ব এবং সাথে আফ্রিকার প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতি এবং প্যাসিফিক ছিল সবশেষে। বোল্টের মতে এই বিবর্তনবাদী ধারণা নিয়ে প্রশ্ন উঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে- যেখানে প্রযুক্তির উন্নতি ও নৈতিক যোগাযোগের সাথে যুক্ততা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নরবর্ণবাদীদের কাছে ভাষা, মস্তিষ্কের গঠন বা গাত্র বর্ণ কোন কিছুর বিচারেই আর বিদ্যমান মানব জাতি সমূহ থেকে উৎস অনুসন্ধান স্বস্তিদায়ক থাকে না। এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা ছিল আরামকেদারার নৃবিজ্ঞানীদের কাজ নির্ভর এবং এপর্যায়ে এসে আরামকেদারার নৃবিজ্ঞানীদের অপ্রতুল তথ্যভান্ডার অনুধাবন করা হয় এবং তাই সরাসরি প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জোর দেওয়া হতে থাকে।

এই তর্ক বিতর্ক যখন চলছে, সেই ঔপনিবেশিক সময়ে ভারত রাজ্যে ভিক্টোরিয়ান বিচার বিশ্লেষণকে উদাহরণ হিসাবে নেয়া যায়। বোল্টের আলোচনা থেকে ভারত রাজ্যে ভিক্টোরিয়ানদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে তর্ক বিতর্ক এবং রাজ্য পরিচালনার নীতিমালাসমূহ উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ভারত রাজ্যে ব্রিটিশদের শাসন প্রক্রিয়া ও নীতিমালাকে আমরা সাধারণত সমরূপ হিসাবে দেখে থাকি, বোল্টের কাজ থেকে স্পষ্ট হয় যে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কোনভাবেই সমরূপ ছিল না। বরং বিবিধ তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি এগিয়েছে।

ভারতবর্ষ : ভিক্টোরিয়ানদের বর্ণবাদিতার উদাহরণ

ভারতবর্ষে ভারতীয় ধর্মসমূহ ও সভ্যতার প্রতি ভিক্টোরিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে বোল্ট মিশনারী ও ভ্রমণকারী, আমলা ও সিপাহীদের লেখা বই প্রবন্ধ ও ব্রিটিশ প্রেসের সাহায্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে ভিক্টোরিয়ানদের কী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা বোঝার ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এ সময় ব্রিটিশ লেখালেখিতে ব্যর্থতা ও অর্জন, উভয় অনুভূতি প্রসঙ্গে একটা সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। যেমন লন্ডন জার্নালের এক লেখায় বলা হয়েছে যে "এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্পর্কের একটা রোমান্টিক সময় শেষ হয়ে বাস্তবতা এবং সাবধানতার যুগ শুরু হয়েছে"। এই বিদ্রোহ ভিক্টোরিয়ান ব্রিটিশদের ক্ষুব্ধ করেছিল, কারণ তাদের মনে হয়েছিল, ভারতীয়

মানুষজন এই বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটেনের প্রতি তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ ভারতে যে প্রেক্ষাপটে এ আন্দোলন হয়েছিল, তা হলো, ১৮৩৫ এ নৈতিক ও রাজনৈতিক এক সংস্কার শুরু হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষ আমলা গড়ে তোলা কিন্তু এর ফলে, আসলে রাজপুত্র ও ভূমি মালিকদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস অপমানিত হয়েছিল বলে পুরনো ঐতিহ্যের পক্ষের লোকজন সতর্ক হয়ে যায়। ফলে বাঙালীদের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ দানা বাঁধে (এই বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কারণ ছিল, বন্দুকের যে নতুন কার্টিজ দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়, তাতে গরু ও শুকরের চর্বি থেকে তৈরি তেল ব্যবহার করা হয়েছিল- এতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষজনই অপমানিত হয়েছিল)। প্রচন্ড রক্তপাতের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ দমন করা হলেও, এর ফলে আরো আমলাতান্ত্রিক সংস্কার হতে থাকে। কোম্পানীর হাত থেকে শাসন ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে যায়। মিশনারীরা পূর্বে কোম্পানী আমলে, ভারতে ধর্ম প্রচার করবে কিনা এ নিয়ে তর্ক ছিল- ফলে পলিসি ছিল খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে এবং কোম্পানী ভারতে মিশনারীদের প্রবেশের বিরুদ্ধতা করা, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল মিশনারীরা গসপেলের ধারণা প্রচারের করলে, অধীনদের উপর ইতোমধ্যে তাদের যে অনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ ছিল তাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে এই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে মিশনারীরা, কোম্পানীর শাসন নীতির বিপরীতমূখী দ্বৈত সমালোচনা করে। একদিকে তারা যেমন ধর্মীয় নিরপেক্ষতার সমালোচনা করে, এর ফলে ইংরেজরা নেটিভদের কৃতজ্ঞতা হারিয়েছে, অপরদিকে ১৮৫৪ সালের সংস্কারের ফলে ইংরেজ শাসকেরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তারা মনে করে, ফলে তাদের মতে এতে ঐতিহ্যবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাদের ধারণা এর ফলে তিন বছর পরের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল এই ক্ষোভের প্রকাশ।

আফ্রিকার অবস্থার সাথে ভারতের অবস্থা তুলনা করলে দেখতে পাই, আফ্রিকার চেয়ে ভারতে মিশনারীদের অবস্থা বেকায়দার ছিল। অনেক বছরের সাধনার পর এখানে তাদের পক্ষে যায় এমন সামান্যই অর্জন ছিল। কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ভিক্টোরিয়ানদের চোখে এখানকার হিন্দুবাদ, ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের মুঠি 'আফ্রিকান 'উপজাতিদের' মধ্যে প্রচলিত ফেটিশিজমের তুলনায় অনেক সুসংগঠিত ছিল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে তা আরো শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু আফ্রিকার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল, কারণ ওখানকার ধর্মীয় কোন চর্চাকেই ভিক্টোরিয়ানরা প্রশংসা করেনি। ভারতে এরা অন্ততঃ স্থানীয় ধর্মচর্চা থেকে পাওয়া সংস্কৃতি ও আরবী সাহিত্য, মন্দির ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রীগুলো পছন্দ করেছিল। হান্টারের উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করতে চাই, "ভারত, ধর্ম ও দর্শন এই দুটো জিনিস পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে" (১৮৮৬, উদ্ধৃত করেছেন বোল্ট, ১৯৭১, পৃ ১৬৩)। ১৮৫৭ সালের পর অবস্থা রাতারাতি বদলায়নি। ১৮৫৮ সালে রানীর শাসন আসার পর রানী হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের স্বকীয়তার প্রতি আস্থা/শ্রদ্ধা রেখে ঘোষণা দেন যে-"আমরা খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল থাকব এবং অন্যান্য ধর্মের স্বকীয়তাকেও স্বীকার করে নেব।" এই

ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, ধর্মের ভিত্তিতে অধীন বা আর কাউকে আইনের চোখে অসমতার শিকার হতে হবে না। এই ঘোষণার ফলে মিশনারীরা কোম্পানী আমলে যে অসমতার শিকার হয়েছিল তা থেকে মুক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের অনুমতি লাভ করে তারা। এ ঘোষণা অবশ্য সরকারের পূর্বতন নিরপেক্ষতার ব্যবস্থাকে অটুট রাখে। ফলে লন্ডন মিশনারী সমাজ পলিসির এই বৈপরীত্যকে সাথে সাথে চিহ্নিত করে। কিছু জায়গায় মন্দিরের রাজস্ব আদায় ও প্রাপ্ত অর্থ ছাড়করণের মাধ্যমে নিরপেক্ষতার স্পষ্ট প্রমাণ তৈরি হয়। সাথে সাথে সরকারী স্কুল ও কলেজে এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতিকে কারণ দেখিয়ে খ্রীস্টান মাধ্যম চালু করার পক্ষে যুক্তি শক্তিশালী হয়। মনে করা হচ্ছিল এ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা সেক্যুলার শিক্ষার কারণে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠছে এবং এর মাধ্যমে এদের বৃটিনের প্রতি ঘৃণা তৈরি হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনৈতিক ও বিপ্লবী নীতি তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে যারা মিশনারীদের জন্য সরকারী শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন, তারা অত্যন্ত সমালোচিত হন। বুদ্ধিজীবিরা এসময় ভাবতে থাকে, ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্ব ভালভাবে রক্ষা হচ্ছে- ঈশ্বর এর জন্য সহায়তা করছে। ফলে ১৮৫৮ সাল থেকে খ্রীস্টান মিশনারীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই নতুন অবস্থায় স্থানীয় ধর্মগুলো অনুধাবন করছিল যে খ্রীস্টান আধিপত্য যে কেবল তাদের সদস্যদের জন্য হুমকি হচ্ছে তা নয়, তাদের সমগ্র জীবন ও ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি খ্রীস্ট ধর্ম হুমকি হয়ে দাড়াচ্ছিল। ফলে এসময় হিন্দু সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুররা সামাজিক সংস্কার শুরু করেন। আবার রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক প্রশিক্ষণের সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী খ্রীস্টধর্ম ও পাশ্চাত্যের প্রভাবকে মোকাবেলা করতে গিয়ে হিন্দুবাদকে শুদ্ধ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং তাই আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। একই সময় সৈয়দ আহমেদ ও সৈয়দ আমির আলীর প্রচেষ্টায় মুসলিমদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়। এতে করে তৎকালীণ সময়ের ক্রমবর্ধমান মিশনারীদের কাজ বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এ ঘটনাগুলি বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হয়।

অথচ আফ্রিকার ক্ষেত্রে চরম বর্বরতা, আজব উপস্থিতি এবং সাধারণভাবে আদিম জীবন যাপনই এরা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভারতীয় বা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান জনগনের আত্মিক উন্নতি ঘটাতে সক্ষম জ্ঞান (যা ধর্ম থেকে এসেছে) এ অঞ্চলে আসা পরিব্রাজকদের মুগ্ধ করত। মিশনারীরাও সচেতন ছিল যে শতবছরের প্রাচীন সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্বাস এখানকার মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে ও আকৃতি দিয়েছে। ফলে এই মানুষদেরও উৎকৃষ্টতা রয়েছে এই অস্বস্তি থেকে আবার মিশনারীদের মধ্যে হিন্দুবাদ সম্পর্কে অপছন্দও বাড়তে থাকে। বিভিন্ন জায়গায়/ রিপোর্টে খ্রীস্ট ধর্মের অগ্রগতি এবং তার প্রয়োজনীয়তা, হিন্দুবাদের বর্বরতা সম্পর্কে লেখালেখি হতে থাকে। এক্ষেত্রে বর্বরতা ও সভ্যতার মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা হয়- বর্বররা অশুভ ও মন্দ, বর্বররা বলিদান, নৃত্য ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে মুক্তি পেতে

চায়, অন্যদিকে সভ্যরা প্রার্থনার সাহায্যে মুক্তি পায় (লুব্বক, উদ্ধৃত করেছেন বোল্ট, ১৯৭১, পৃ ১১৫,)। ভারতের হিন্দু মুসলিমরা অসভ্য প্রকৃতির। যেমন ঐতিহাসিক হান্টার (১৮৪১, উদ্ধৃত করেছেন বোল্ট, ১৯৭১, পৃ ২২৩) ভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত শিবলিঙ্গ পূজা থেকে এদের ধর্মকে চিহ্নিত করেছেন কাম নির্ভর ধর্ম হিসাবে। এর মধ্যে মনির উইলিয়াম (১৮৮৪, উদ্ধৃত করেছেন বোল্ট, ১৯৭১, পৃ ৪৮৮) আবার বলছেন খ্রীস্টানদের মুসলিম ও বৌদ্ধদের তুলনায় হিন্দুদের প্রতি অধিকতর দায়িত্ব রয়েছে। কারণ হিন্দু ধর্ম অধিকতর বর্বর ও রক্তচোষা ধরনের, এবং অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই হিন্দুত্বকে ধর্ম হিসাবে মানতেই তিনি নারাজ ছিলেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আপত্তিকর সামাজিক বিষয় যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ থাকা ইত্যাদি তার এই বিশ্লেষণে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ করে তার মতে হিন্দুদের দূর্বল ধরনের মস্তিষ্ক অথবা মেধার অভাব, তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে। কারণ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হলে, এই ধর্মের হৃদয় জয়ের আগে, বিশেষ কিছু বাস্তবতা এবং ধর্ম ও চর্চার ক্ষেত্রে পুরুষোচিত যৌক্তিকতাগুলো বুঝে নিতে পারতে হয়। তিনি মনে করতেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এগুলো বোঝার মত ঘিলুই নেই। হিন্দু ধর্মকে অনৈতিক হিসাবে চিত্রিত করা হয়। অনৈতিকতার পাশাপাশি হিন্দু ধর্মকে প্রতিমা পূজা, সতীদাহ, শিশুহত্যা, চড়কে চড়া, স্ব-অঙ্গচ্ছেদ এবং নরবলি ইত্যাদির জন্য এবং আরো কিছু 'প্রতিক্রিয়াশীল' চর্চার জন্য যেমন বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধতার জন্য সমালোচনা করা হয়। ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে বর্ণবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন দক্ষিণ ভারতের কালোদের আফ্রিকা ও মালায় পেনিনসুলার অধিবাসীদের জ্ঞাতি মনে করা হয়। ধরা হয় এরা ভারতীয়দের মধ্যে আবার সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তবে এসময় হিন্দুদের জাতবর্ণ প্রথা বোঝা ও না বোঝা নিয়ে বেশ তর্ক চলতে থাকে।

আরো একটি বিষয় দেখা যায়- উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারের কারণে মনে করা হত যে, মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় শুদ্ধতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বীকার করা হয়েছিল, এরা আধিপত্যকারী নয় বরং প্রান্তিক সংখ্যালঘু ও একসময় জয়ী ছিল, কিন্তু ঐসময় তারা ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত ও তাদের ক্ষমতার অধীন ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা স্বীকার করেছিল যে ইসলামকে ধ্বংস করা অসম্ভব প্রায়- বরং মুসলমানদের সাথে খ্রীস্ট ধর্মের সহযোগিতার সম্ভাবনার বিষয়ে ভাবা উচিত। এখানেও শ্রেষ্ঠতার ধারণা কাজ করেছে। মুসলমানদের অতীত সামরিক বাহিনী এবং রাজস্বের পদগুলো হারানো ও শিক্ষায় অনগ্রসরতার জন্য তাদের প্রতি সহানুভূতি কাজ করে। একই সাথে এটাও কাজ করেছিল যে, যেহেতু ব্রিটিশরা জয়ীর ভূমিকায় এবং সেহেতু তারাই উদারতা প্রদর্শনে সক্ষম।

আফ্রিকায় ও ভারতে তাদের কাজ প্রসঙ্গে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। গড় ভিক্টোরিয়ানদের অবশ্য ভারতীয় ও আফ্রিকান সভ্যতার চরিত্র, শিক্ষার সম্ভাবনা, পরিশ্রম ও উপস্থিতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান ছিল। এই শতক শেষে

সন্দেহাতীতভাবে ব্রিটিশদের বর্ণ প্রসঙ্গে সংস্কার জোরদার হয়- এবং তারা পৃথিবীর সব মানুষদের এক কাতারে ভাবতে থাকে। সিপাহী বিপ্লবের পর অহরহ শোনা যেত, ব্রিটিশরা ভারতীয়দের ঘৃণার সাথে 'ইন্ডিয়ান নিগার' সম্বোধন করছে। কিন্তু ১৮৭০ এর দিকে জাতীয়তাবাদী ও অর্থনৈতিক সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় কিছু ক্ষেত্রে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। আফ্রিকার ক্ষেত্রে তা হয়নি, কেবলমাত্র কম ক্ষমতাসম্পন্ন 'আদিবাসী রক্ষা সমাজের' কাছে এরকম সহযোগিতা কাম্য ছিল। তবে এসময়ে ভারতীয়দের মেজাজ সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ানদের দুটো পরস্পর বিরোধী ধারণা ছিল। একটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী নরম হিন্দুর ধারণা, অন্যটি নির্মম ও অত্যাচারী ওরিয়েন্টের ধারণা, যাদেরকে শক্তপোক্ত সরকারের অধীনে রাখতে হয়। বোল্টের সমগ্র আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই ভারতীয়দের সম্পর্কে ধারণা কলোনিকালে ব্রিটিশদের আফ্রিকানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে ভিন্ন কিছু ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই তারা অন্যান্যদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভেবেছিল। বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঐ ভাবনার নিয়ামক। ব্রিটিশ ভারতে বিদ্রোহের আগে পরে ভারতীয়দের প্রতি যে অবস্থান ছিল, তাকি উপনিবেশ উত্তর ভিক্টোরিয়ানদের সময়ে রাতারাতি বদল হয়ে গিয়েছিল? উল্লিখিত বিশ্লেষণের ছিটাফোঁটা কি বর্তমান দুনিয়ায় রাষ্ট্রগুলো যে সম্পর্কের মধ্যে নেই অথবা নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকান্ডের পরবর্তী বিকাশে কি কোন প্রভাব নেই? এই প্রশ্নগুলো আমাকে তাড়িয়ে ফেরে বলে, পরবর্তী অংশে সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখার প্রাথমিক প্রেক্ষিত আলোচনা করব।

অতঃপর আরামকেদারা-উত্তর নৃবিজ্ঞান

যে সময় বোল্ট আলোচনা করছিলেন, নৃবিজ্ঞানে উৎস প্রসঙ্গে পলিজেনেসিস এবং মনোজেনেসিস বিতর্ক, ঐ সময়ে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে বিশ্লেষণের ধরন অনুসন্ধান করতে গিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক ও পার্থক্য বিবেচনা প্রসঙ্গক্রমে জরুরী হয়ে পড়ে। যদিও দৈহিক নৃবিজ্ঞান কিংবা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান আবার পৃথিবীর বড় বড় ধারার ঐতিহ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিক হয়েছে। যেমন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, জনসংখ্যাগত দিক দিয়ে, পদ্ধতিগতভাবে, প্রত্যক্ষণের দিক দিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীতে দৈহিক নৃবিজ্ঞান খুব জোরালোভাবে বিকশিত হয়েছিল। ইউরোপের এই অংশে নৃবিজ্ঞানকে এথনোলজি অর্থে বোঝানো হত- যা হল এথনোলজির পাঠ, মানব ভিন্নতার অধিকতর সংস্কৃতি নির্ভর পাঠ, যা পূর্বতন মনোজেনেসিস ধারার সাথে যুক্ত ছিল (স্টকিং, ১৯৮৮, পৃ ৯)। অন্যদিকে এ্যাংলো আমেরিকান ধারার নৃবিজ্ঞানে পুরোন এথনোলজি এবং একইসাথে নতুন বিবর্তনবাদী ধারা শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল। সেখানে দৈহিক নৃবিজ্ঞান 'চার শাখার এক শাখা' হিসাবে বিবেচিত হয়- একটি শাখা এথনোলজি, যা আবার পরবর্তীতে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে পরিচিতি পায়। এছাড়া আছে ভাষাবিদ্যা (linguistic) প্রাক-ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব (pre-historical archealogy)। ধরে নেওয়া হয়েছিল, এই

শাখাগুলোর বিবর্তন ও ঐতিহাসিক বিকাশে Diacronic process এর মাধ্যমে যুক্ততাই হচ্ছে এদের ঐক্যের ভিত্তি (প্রাগুক্ত)।

এই প্রেক্ষাপটে নরবর্ণের বিষয়টি পরবর্তী নৃবিজ্ঞানে কিভাবে উল্লিখিত হয়েছে, সেটা অনুসন্ধান করে দেখতে পাই যে, এ্যাংলো আমেরিকান ধারার ফ্রাঞ্জ বোয়াস ১৯০০ সালের দিকে উনিশ শতকের নরবর্ণবাদী অনুমানকে সমালোচনা করেন। উপমহাদেশীয় ঐতিহ্য থেকে তিনি এসেছিলেন, এবং একাধারে তিনি এথনোলজি ও দৈহিক নৃবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত ছিলেন বলে, নৃবিজ্ঞানের চারটি শাখাতেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। একাধারে ইহুদি, জার্মান ও আমেরিকান পরিচয় ছিল বলেও, আর বাফিন দ্বীপে ও উত্তর পশ্চিম প্যাসিফিকের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বোয়াস উপলব্ধি করেন যে সমগ্র মানব ভিন্নতাকে আপেক্ষিক ঐতিহাসিক বিচারে বিবেচনা করা উচিত। অন্যরা সমালোচনায় অংশ নিলেও স্টকিং (১৯৮৮) দেখতে পান বোয়াসই, আধুনিক নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে নরবর্ণ ও সংস্কৃতির চিন্তার যোগসূত্রতার মধ্যে স্থাপন করেন। বোয়াসের অবশ্য মনোজেনেসিস্টদের সাথেই গভীর গাঁটছড়া ছিল। তিনি নিজে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে নয়, বরং গণিত থেকে এসেছিলেন বলে 'খাঁটি' বর্ণের ধারণায় বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত বিন্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের (যা আবার একটার সাথে আর একটি ভিন্ন হতে পারে বলে তিনি মনে করছেন) তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এ বিশ্লেষণ অপূর্ণাঙ্গ শ্রেণীকরণ করেছে সন্দেহ করে তিনি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেন যা গতিশীল এবং ঐতিহাসিক। তিনি দৈহিক ভিন্নতার ভিত্তিতে কোন জনগোষ্ঠী বেশী আদিম বা বানর সদৃশ এ ধারণাকে ভীষণভাবে চ্যালেঞ্জ করেন। বরং দৈহিক ভিন্নতার প্রশ্নে তার আগ্রহের জায়গা ছিল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অর্থে বিকল্প বিশ্লেষণ। কারণ দৈহিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। যেহেতু সংস্কৃতির বৈশিষ্টগুলো এক গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীতে ব্যাপক ভাবে ছড়ানো থাকে, তাই বোয়াসের মতে সংস্কৃতি বিকাশের কোন একক বিবর্তনের ধারা চিহ্নিত করা যায় না, বরং তিনি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির কারণে মানব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মনঃস্তাত্ত্বিক ভিন্নতা হয় বলে সিদ্ধান্ত দেন। বোয়াস অবশ্য জৈবিক ও সংস্কৃতির সম্পর্ক প্রশ্নে তার অবস্থান পরিস্কার করেননি। যদিও তিনি সারাজীবন ধরে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক কী প্রভাব থাকে তা খুঁজতে চেয়েছেন। তবে এটা বলা যায় যে, বোয়াসের সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুটো জগৎকে (জৈবিক ও সাংস্কৃতিক) পৃথক করা। তিনি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিবর্তনবাদ চর্চায় বর্ণবাদী বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যাপক সমালোচনা করেছিলেন। বিশেষ করে যখন নাৎসিরা বিবর্তনবাদী যুক্তি আধিপত্যের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। তবে বলাই বাহুল্য বিবর্তনবাদীরা সকলেই জৈবিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর সরলভাবে যুক্ত এমন ধারণা অনুসরণ করেননি। যেমন আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি, বৃটিশ বিবর্তনবাদী মর্গানও পশু ও মানুষ পাঠের ক্ষেত্রে জৈবিক বিশ্লেষণের সাথে স্পষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন।

তার আগ্রহের জায়গা ছিল, পশু ও মানুষের মনের বিবর্তন বোঝা। তার মূল যুক্তি ছিল মানব জাতির মন বিবর্তিত হয়, একইভাবে পশুদেরও মনের বিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে তিনি কোন সাধারণ সমীকরণ করে বলেননি যে পশু মন বিবর্তিত হয়ে মানব মনে উন্নিত হয়েছে। তিনি বন্যদের বুদ্ধিদীপ্ততা প্রশ্নে জৈবিক নির্ধারণবাদীতার বিরোধীতা করেন। কারণ বন্যদের জৈবিক বিষয়টিও নির্ধারিত হয় সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দিয়ে[৪] (স্যুইল্টজ, ১৯৮৮)। যাহোক ১৮৬০ এর পর থেকে নৃবিজ্ঞানে বিবর্তনবাদের বিরোধী অবস্থান তৈরি হয়, সেটা শুধু বোয়াসিয়ান ধারা থেকে না, বৃটিশ ক্রিয়াবাদী ও ব্যাপ্তিবাদী স্কুলও ব্যাপক সমালোচনা করে। এই ধারাবাহিকতা পরের শতক পর্যন্ত ছিল।

বিংশ শতকে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্রের প্রচেষ্টা হয়। ১৯৫০ এর দিকে ওয়াশবার্ন ও তাঁর দল নতুন ধরনের জৈবিক নৃবিজ্ঞান পাঠের প্রকল্প হাতে নেন, বিশেষ করে মানব জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন নয়, একটা প্রজাতি বিবেচনা করার প্রক্রিয়ায় সর্বজনীন মানবাধিকার ধারণা বিবেচনার মধ্য দিয়ে, নরবর্ণ ভিত্তিক উৎস রহস্য পাঠের প্রেক্ষাপটের বদল ঘটে। যদিও 'সর্বজনীনতা'র ধারণা একধরনের নির্দিষ্ট মানের মানব সমাজের সমস্যাকে বিবেচনা করে বলে, প্রশ্নের মধ্যে পড়ে। এই তর্কের মুখে 'আন্তর্জাতিক' মানবাধিকারের ঘোষণা আসে। ওয়াশবার্ন তার নব্য বিবর্তনবাদী ধারণা থেকে এক্ষেত্রে জৈবিক মানুষ এবং আচরণ বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কথা বলেন। এই সময় প্রাইমেট আচরণ পাঠও এইজন্য বিবেচিত হতে থাকে (হারাওয়ে, ১৯৮৮)। তবে এসময়ের আগ পর্যন্ত জৈবিক নৃবিজ্ঞানের সাথে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। ওয়াশবার্নের কাজ প্রসঙ্গে ডোনা হারাওয়ের আলোচনা থেকে জানা যায়। আমার অন্যতম উদ্দেশ্য সেই আলোচনাটি এখানে উপস্থাপন করা।

তবে প্রসঙ্গক্রমে হারাওয়ের আন্তর্জাতিক মানব ঘোষণার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ অত্যন্ত দরকারী প্রশ্নের উত্তর দেয় বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। তার কাজে পূর্বে উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে মানব প্রজাতির বিভিন্নতা প্রসঙ্গে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান UNESCO র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ও রূপান্তরণ, তার সাথে নৃবিজ্ঞানসহ অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। হারাওয়ে ওয়াশবার্নের আলোচনার যে পর্যালোচনা করেছেন তা আমি প্রসঙ্গতই উপস্থাপন করছি। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নৃবিজ্ঞানী, ওয়াশবার্নের দীর্ঘসময়ের প্রকল্প, তার প্রভাব (বিশেষ করে UNESCO ঘোষণায়) আলোচনা করতে যেয়ে হারাওয়ে দেখেছেন- ওয়েনার গ্র্যান ফাউন্ডেশন মনোযোগ দেওয়ার জন্য আফ্রিকার আদি মানবের অপর নাম দাঁড়ায় সর্বজনীন মানব, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর জাতিসংঘের দেয়া নাম। স্নায়ু যুদ্ধের পরিবেশে বৈশ্বিক নিউক্লিয়ার ও নাগরিক বিস্তৃতি এবং উপনিবেশ মুক্ত হওয়ার লড়াই ছিল এর প্রেক্ষিত । হারাওয়ে বলেন, এর মধ্যে আফ্রিকার আদি মানব (Early Man in Africa) ও UNESCO র সর্বজনীন মানব (Universal Man) পরিণত হয় শিকারী মানবে (Man the Hunter),

পরবর্তী নিউক্লিয়ার মানবের নিশ্চয়তা সে। তিনি দেখান, বিশ বছরের গবেষণা ও শিক্ষা দেয়ার মধ্য দিয়ে শিকারী মানব ধারণার একটি আকার দাঁড়িয়ে যায়। এই মানব হবে পাশ্চাত্যের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর, দাগহীন, সর্বজনীন প্রজাতি। হারাওয়ে মনে করেন প্রাকৃতিক সহযোগিতাপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ধারণার মানবের বিপরীতে দাঁড় করানো হয় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকল্প এই শিকারী মানবকে। হয়তো ভবিষ্যৎ স্নায়ুযুদ্ধত্তোর মুক্ত দুনিয়াতে এই শিকারী মানবকে পাওয়া যাবে, এমন পরিকল্পনা ছিল। এই মানবের প্রযুক্তি ও তার ভ্রমণের অভিলাষ, মুক্ত দুনিয়ার মতাদর্শ, বিনিময় ব্যবস্থাকে ভয়াবহ একটা জায়গায় পৌঁছে দেবে। তার ঔদ্ধত্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সহযোগিতারকারী হিসাবে কাজ করবে, যে ঔদ্ধত্য মানব ও মানবের কাছাকাছি প্রজাতির অভিযোজনের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা প্রয়োজনীয়ও ছিল। ডোনা হারাওয়ের এই বিশ্লেষণে আবার পরে আসছি, এখন আগে হারাওয়ের বিশ্লেষণে ওয়াশবার্নের প্রকল্প বুঝে নেই।

হারাওয়ে মনে করেন, ওয়াশবার্ন ও তার সহযোগীরা শিকারভিত্তিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে আধুনিক বিবর্তনবাদী মিথোস্ক্রিয়ার অংশ হিসাবে নতুন জৈবিক নৃবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করতে পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি মনে করেন এইরকম আধুনিক মিথস্ক্রিয়ায় প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মতবাদ তৈরী হয়- যার মাধ্যমে জীববিজ্ঞানে সর্বজনীন মানব প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরদিকে উদারনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন মানব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যকার ফারাক ঘোঁচানোর জন্য আচরণ বিজ্ঞান (Behavioral science)[৫] নামক জ্ঞানকান্ডের প্রস্তাব করেন ওয়াশবার্ন। ওয়াশবার্নের পুরো জীবনের কাজের মূলনীতি ছিল, functional comparative anatomy যার অর্থ হলো, কাঠামো, ক্রিয়াশীলতা, প্রত্যঙ্গ ও আচরণের পারস্পরিকতার মাধ্যমে গঠিত সম্পর্ক তুলনামূলক, বিবর্তনবাদী ও উন্নতিগত ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। ওয়াশবার্ন র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ও ম্যালিনোস্কির ধারণা বিশ্লেষণ করেছিলেন, তথাপিও জৈব নৃবিজ্ঞানের ক্রিয়া ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তার ধারণা তুলনামূলক বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানভিত্তিক ছিল। এজন্য তিনি মানব বিবর্তন বুঝেছেন, অন্যন্য প্রাইমেটদের ক্রিয়ামূলক ও তুলনামূলক অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা পাঠের মাধ্যমে। সেইজন্য হারাওয়ে বলছেন, ওয়াশবার্নের ছাত্রদের প্রাইমেট পাঠের সাথে সাথে চিকিৎসাবৈজ্ঞানিক অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা পড়তে হত। তিনি আরো দেখান, ওয়াশবার্নের বিশ্লেষণ ছিল, বানর জাতীয় প্রাণীর সাথে মানুষের দৈহিক পার্থক্য হয় বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াশীলতার পার্থক্যের জন্য যে দৈহিক আকৃতির বদল হয়, সে কারণে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ। সাম্প্রতিক এইপের (South African Man-apes) আবিস্কার ও তার শ্রোণির গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আধুনিক মানুষ এবং ছোট মস্তিষ্কের অস্ট্রলোপিথিকাস উভয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে পারত। সুতরাং ওয়াশবার্নের কাছে দুপায়ে হাঁটা মানে হচ্ছে, মানুষ বিবেচনা করতে হলে হাঁটার মত জটিল আচরণের বৈশিষ্ট্য মানুষের থাকতে হবে। অভিযোজনের ধারণা এখানে জরুরী। হারাওয়ে উপস্থাপন করেন, ওয়াশবার্নের

মতে একটি অভিযোজন থেকে অন্য অভিযোজন এসেছে, যেমন জটিল শ্রোণির অভিযোজনের কারণে ভূমিতে বসবাসের অভিযোজন এসেছে, বিশেষ করে হাতিয়ার ব্যবহারের সংস্কৃতি এসেছে। প্রাথমিক মানবিক অভিযোজনের জটিলতার সাথে সাথে প্রাণীরা নিজেদের পুনর্নির্মিত করতে আচরণগত অভিযোজন করেছে। এটাই বিবর্তনমূলক বৈজ্ঞানিক মানবিক হওয়ার মূল যুক্তি। এই চিন্তানুযায়ী সংস্কৃতি অর্থ হলো, প্রাথমিকভাবে হাতিয়ারসমূহ। সংস্কৃতি প্রাণীকে পুনর্নির্মিত করে। পাশ্চত্যের প্রকৃতি সংস্কৃতির দ্বৈততার সমাধা ঘটে স্বনির্মিত দ্বান্দ্বিক উৎপাদনবাদিতার মাধ্যমে, যা সর্বজনীন মানব জীবন যাপনের অর্থ তৈরী করে।

হারাওয়ের আলোচনা থেকে জানা যায়, যেহেতু ওয়াশবার্নের মূল যুক্তি ছিল, প্রাকৃতিক নির্বাচন হয় ক্রিয়াশীলতার জন্য, তাই নৃবিজ্ঞানীর জন্য মূল সমস্যা হল, আচরণ (behavior) বোঝা, আর এক্ষেত্রে আচরণ হচ্ছে, সোজা হয়ে হাঁটা, যার জন্য আবার দ্বিতীয় অভিযোজন হাতিয়ার ব্যবহারকারী সংস্কৃতি গ্রহণ করা, এর ফলে শরীর পূনর্গঠিত হয়। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার বিষয়। এক্ষেত্রে ওয়াশবার্নের আরো অনুমান ছিল, সকল প্রাণীকুলের মধ্যে পুরুষ সাধারণতঃ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে- হাতিয়ারের মাধ্যমে পালন করা সম্ভব হলে, বড় বড় দাঁত সহ অন্যান্য আত্মরক্ষামূলক শারীরিক গঠন বদলে ছোট হয়ে আসতে থাকে। এরপর ১৯৫০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে অভিযোজনমূলক জটিলতা আরো সুস্পষ্টভাবে বিবেচিত হতে থাকে, ফলে শিকারী নির্ভর ব্যবস্থা আসে। ৬০ এর দশকে এসে গবেষণা ও গ্র্যাজুয়েট প্রশিক্ষণে, আফ্রিকার হোমিনিড ও মানব/মানবের কাছাকাছি ফসিল পাঠে বুনো প্রাইমেট নিরীক্ষা ও শিকার সংগ্রহকারী মানব পাঠ যুক্ত হয়। এছাড়া, তৎকালীন স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাবে, নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির প্রচলনে, বৈশ্বিক নগরায়নে, পরিবেশগত বিপর্যয়ে, যৌনগত ও বর্ণগত রাজনীতির কারণে সর্বজনীন মানবের উপর গভীর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি ও তার সহযোগীরা মানুষের মনে ও দেহে উল্লিখিত কারণে সৃষ্ট স্নায়ুচাপও (stress) পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য বিবেচনা করতে চান। ওয়াশবার্নের এই প্রকল্পের ব্যাপক সমালোচনা করেন ডোনা হারাওয়ে, কারণ শিকারী মানব ধারণা তথা UNESCO র সর্বজনীন মানব ধারণায় শিকারী হিসাবে বা নিরাপত্তা প্রদানকারী হিসাবে পুরুষকেই বিবেচনা করা হয় - নারী ও তার সংস্কৃতি বিবেচিত হয়নি, পুরুষের মধ্যে বিলিন হিসাবে নারীকে রাখা হয়েছে।

এপর্যায়ে আবার ফিরছি ডোনা হারাওয়ের বিশ্লেষণে, তিনি UNESCO র আন্তর্জাতিক মানব ঘোষণার প্রেক্ষাপট ও ঘোষণার রূপান্তর বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন এর সাথে বিভিন্ন জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্ক জড়িত, যার সাথে বোয়াসিয়ান ধারা ও ওয়াশবার্নের প্রকল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে।

বিভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কের প্রকাশ জাতিসংঘের ঘোষণায়

হারাওয়ে বলেন, ১৯৫০ ও ১৯৫১ এ বর্বর ধরন ও বর্ণের বিবিধতা সম্পর্কে জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঘোষণা দেওয়া হয়,

তাতে প্রতিষ্ঠানটি একাধারে ফ্যাসিবাদ ও উপনিবেশবাদের সীমানায় অবস্থান নেয়, অন্যদিকে বহুসত্তাবাদী অবস্থান নেয়। যখন ১৯৮৮ সালে সাধারণ সভায় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গ্রহণ করা হয়, তখন রেনে কাসিন, 'আন্তর্জাতিক' এর জায়গায় 'সর্বজনীন' প্রত্যয়ে পরিবর্তনে সফল হন। 'সর্বজনীন' মানব সহজেই নির্দিষ্ট ইতিহাস থাকার জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে বিমূর্ত হয়ে উঠে। যেমন আন্তর্জাতিক বললে এটা বলার সম্ভাবনা থাকত যে, বিশেষ মানবাধিকার কোন জাতির জন্য প্রযোজ্য নাই হতে পারে। এতে করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে একে বিমূর্ত করা সম্ভব হয়েছিল। একইসাথে রাজনীতি, ডিসকোর্স ও বিজ্ঞানে মানবের ঐক্য থেকেও একে বিমূর্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

হারাওয়ে দেখান, যেসময় এই ঘোষণা আলোচিত হচ্ছিল তখন জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের ছাপ্পান্নটির মধ্যে আটটি ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ছয়টি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাদের যুক্তি ছিল এই ঘোষণার গুরুতর ত্রুটি আছে, এটা কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর মানুষকে রাজনৈতিক অধিকারই দিচ্ছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকার দিচ্ছে না অথচ এই অধিকারগুলো পাওয়ার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকে। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা মনে করেছিল "বিজ্ঞান" এই সর্বজনীন মানুষকে এই মতগুলোর চাইতে বেশী কিছুতে নিয়ে যাচ্ছে-অর্থৎ সুপার মার্কেটে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে বিজ্ঞান হচ্ছে, ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং সমাজতান্ত্রিকতার বাস্তব প্রয়োগ, এ আলোচনা স্নায়ুযুদ্ধের ভাষার রাজনীতিকেই আমাদের সামনে হাজির করে।। হারাওয়ের বিশ্লেষণে "মুক্ত দুনিয়ার" প্রাণবিজ্ঞানের, মানব জাতির ও সমাজবিজ্ঞানের জন্য প্রায়োগিক হতে হলে "স্বাভাবিক" ভাবেই "আচরণ বিজ্ঞান" হিসাবে পরিণতি পেতে হবে। আর আচরণ বিজ্ঞানের অর্থ হলো, মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, দৈহিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, আচরণগত ও জনসংখ্যা জেনেটিক্স, পেলিওন্টোলজি এবং আধুনিক বিবর্তনবাদীদের মিথস্ক্রিয়া। ১৯৫০ এ স্নায়ুযুদ্ধ বেড়ে যাওয়ার ফলে জাতিসংঘের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠানের "আচরণগত" বিশ্লেষণ ছিল সোভিয়েত প্রভাবিত প্রস্তাব "সমাজতান্ত্রিক মানব জীবনের" বিপরীতে মতাদর্শগত বিকল্প । ১৯৫০ এ সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন ধারা বিশেষ করে বোয়াসের বর্ণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা UNESCO র ঘোষণায় প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক ও মতাদর্শগত কারণে জীববিজ্ঞানের মালমশলাও জরুরী ছিল। বর্ণবাদীদের ধারণা মোচনের জন্য ১৯৪৯ এ মনঃস্তত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানীরা মিলে বসে আলোচনা করে এবং ১৯৫০ এ UNESCO বর্ণ সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা দেয়। জীববিজ্ঞানীর অনুপস্থিতি নিয়ে পরে প্রশ্ন উঠেছিল। ফলে দ্বিতীয় ঘোষণার দরকার হয়, দ্বিতীয় ঘোষণা ছিল-

> Scientists have reached general agreement in recognizing that mankind is one, further general agreement that such different group of mankind are due to the operation of evolutionary

> factors of differentiation such as isolation, the drift and random fixation of the material particle which control heredity (the genes), changes in structure of these particles, hybridization and natural selection (UNESCO, 1952: 98).

হারাওয়ে মনে করেন, এই ঘোষণায় মানব ঐক্যের প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে, মানুষের প্রাকৃতিক বিকাশের পর্যায়ে এই ঐক্য ছিলনা। এই ঐক্যের ডিসকোর্স হলো সম্প্রতিক সময়ের প্রাকৃতিক- প্রযুক্তিগত জ্ঞান যা অর্থনীতি বা জীববিজ্ঞানের তুলনায় সতের শতক থেকে উনিশ শতকের প্রাকৃতিক ইতিহাস ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কার্যকারণের সাথে যুক্ত, যা আবার মানব জাতির ঐক্য ও বিকাশের ভিন্নতাকে পরিবর্তন করে না। এই ভিন্নতাকে এখানে population বলা হয়েছে। এই ঘোষণায় আরো যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো, এই দাবি যে, সকল মানব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কোন অসমতা নেই। মানবগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মানসিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। এখানে আরো বলা হয়, "জীববৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হয় যে, সকল মানুষের মধ্যে সর্বজনীন ভাতৃত্ববোধের নৈতিকতা কাজ করে। মানুষ পরস্পরের প্রতি সহোযোগিতার তাড়না নিয়ে জন্মগ্রহন করে, এবং এই তাড়না পূরোন না হলে, জাতিগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে" (UNESCO, ১৯৫২: ১০৩)। হারাওয়ে আবার প্রশ্ন তোলেন ভাতৃত্ববোধ বলার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে এতে কেবলমাত্র পুরুষ বিবেচিত হয়েছে, নারী চিন্তা জগতে আলাদা করে ছিলই না। একে ডোনা হারাওয়ে একধরনের বর্ণবাদ বলছেন, বিশেষতঃ শিকারী মানবের (Man the Hunter) ধারণাকে। ১৯৬০ এর শেষের আগ পর্যন্ত এরকমই ধারণা ছিল। তারপর অবশ্য 'মানব পরিবারের' ধারণায় বর্ণবাদ ও লিঙ্গীয় সম্পর্ক আলাদা করে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা পায়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কোন পার্থক্য না হলেও population এর মধ্যে পার্থক্যের কারণ হিসাবে, জিনের গতি, অভিবাসন, বিচ্ছিন্নতা, মিউটেশন ও নির্বাচনকে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর দুনিয়ায় এই বর্ণবাদবিরোধী ঘোষণাও মানবজাতির জন্য বিশাল সাফল্য বলছেন ডোনা হারাওয়ে, যেখানে ওয়াশবার্নের দীর্ঘদিনের প্রকল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে, যদিও সমাজতান্ত্রিক সাম্য এর মধ্য দিয়ে সুদূর পরাহত হয়েছিল।

আমাদের জগৎ ও এই সমস্ত আলোচনার গতিপথ

উপনিবেশ উত্তর ও তারপর স্নায়ুযুদ্ধত্তোর দুনিয়ায় মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মদতে, সমস্ত আন্তর্জাতিক নীতি কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে, ফিলিস্তিনে ইসরাইলী আগ্রাসন, ২০০০ এ আফগানিস্তানে ও ২০০৩ এ ঈঙ্গ মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসন এবং লেবানন দখল ও ইরান আক্রমনের পায়তারা আমাদের আবারো সর্বজনীন মানব ঘোষণা ও তার পেছনের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। অর্থনৈতিক লাভালাভের কারণে এ আগ্রাসন, সে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের (১৯৯৩) মত তাত্ত্বিকরা স্নায়ুযুদ্ধত্তোর বিশ্বে মানব সভ্যতাগুলোর মধ্যে লড়াই হবে বলে

তত্ত্ব দিচ্ছেন, তার অনুমান অনুযায়ী আবার দেখা যাচ্ছে, কেবল মুসলিম সভ্যতার সাথেই সকলের লড়াই জরুরী। তিনি আসলে দেখেছিলেন বর্তমান পৃথিবীর বেশীরভাগ জ্বালানী তেলের ভান্ডার রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে, হয়ত সেকারণেই তার জন্য জরুরী ছিল মুসলিম সভ্যতার সাথে দরকারী লড়াইকে জায়েজ করতে তত্ত্বীয় মালমশলা সরবরাহ করা। যখন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে domestic democracy র ধারণা থাকে, যাতে 'দুষ্ট'দের (কারা? কে নির্ধারণ করে?) কোন মানবাধিকার সংরক্ষণের দায় থাকে না, এবং মার্কিন দেশে 'ভাল'দের মানবাধিকার রক্ষা করে সমগ্র পৃথিবীকে স্বরাজ্য (empire) বিবেচনা করে বলে ইরাকে, ফিলিস্তিনে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, এসব দেখেশুনে আবার আমার মনে ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পৃথিবীতে আজও মনোজেনেসিস ও পলিজেনেসিস বিতর্কের তৎকালীন সাধারণ নির্যাশ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টতার ধারণা ক্রিয়াশীল। আর সমগ্র বিশ্বে অন্যান্য নীতিমালা যেমন আমার দেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে জনসংখ্যাকে সমস্যা চিহ্নিত করে, জনসংখ্যা কমনোর নীতি গ্রহণ আবার একই সাথে ইউরোপ আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যা হ্রাসের আশঙ্কা থেকে জন্মহার বৃদ্ধির জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণকে (র‍্যান্ডারিয়া, অপ্রকাশিত) আমি একাধারে 'খাঁটি জনসংখ্যার' (eugenic population) ধারণা এবং বর্ণবাদ থেকে এসেছে বলে মনে করি। সুতরাং আমাদের এই জগৎ, ঔপনিবেশিক জগৎ এ আমাদের ঠাকুর্দা পরদাদাদের জগৎ থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। এখন কেবল আমরাও (বাঙালীরা) ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে সমালোচনাহীনভাবে গ্রহণ করে পাহারীদের (আদিবাসী) চাইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিবেচনা/প্রমাণ করতে চাইছি[৫]।

টীকা:

১. উল্লেখ্য বাংলাদেশে প্রকাশিত সূচনামূলক বইগুলোতে নৃবিজ্ঞানের 'আদিম সমাজ' পাঠের ক্ষেত্রে বাঙালীদের আদিম বিবেচনা করা হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে বাঙালীরা সভ্যতার শিখরে রয়েছে বলে মনে করা হয়, অপরদিকে বলা যায় বাঙালীরা যাদের উপর আধিপত্য করে সেই গোষ্ঠীগুলোকে (যাদের 'উপজাতি' বা ট্রাইব বলা হচ্ছে) আদিম বলা হচ্ছে (আহমেদ, ১৯৭০; ইসলাম, ১৯৭৪; বেসিন, ১৯৭৭ অনুবাদক সুফিয়া খাতুন; সামাদ, ৬৭)।

২. ল্যাথাম ভাষার তিন ধরনের শ্রেণীকরণ করেন, মঙ্গোরাইড়ি, আটলান্টাইডি এবং ল্যাপ্টাইডি।

৩. মুলার ভাষার সাতটি শ্রেণীর কথা বলেন, পাপুয়ান, মালায়োপলেনেশিয়ান, নিগ্রো, আমেরিকান, হাই এশিয়াটিক, মেডিটারিনিযান, সেমেটিক, ইন্দো-জারমান।

৪. তবে এখানে যত সরল করে উল্লেখ করা হল, আলোচনাটি অত সরল নয়, এখনও জটিল আলোচনাটি আয়ত্বে নেই, তবে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে বিষয়টি।

৫. এই আচরণ বিজ্ঞানের সাথে অধুনা আমরা বহুল পরিচিত। বিশেষ করে আমরা দেখি, তৃতীয় বিশ্বের মানুষের অনুন্নয়ন বা রোগ শোকের কারণ তার আচরণে নিহিত বলে মনে করা হয়, এই আচরণ পাঠ করা এবং তা বদলে উন্নয়ন ব্যবস্থাপত্রের

সাথে মানানসই করার পথ বাৎলে দেওয়ার মূল দায়িত্ব রয়েছে আচরণ বিজ্ঞানীদের হাতে।

৬. দেখুন ২০০৭ এর স্বাধীনতা পদক লাভ করে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান পার্বত্য চট্টগ্রামের 'যুদ্ধে' জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, সেনাবাহীনির সাথে থাকার জন্য। পার্বত্য আদিবাসীর সত্তা টিকিয়ে রাখার লড়াইকে এক ফুৎকারে 'যুদ্ধের' ডিসকোর্সে রাষ্ট্রীয়ভাবে উধাও করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

Bala, Poonam, 1990, *Imperialism and Medocine in Bengale: A Socio-Historical Perspective*. New Delhi; Sage Publication.

Bolt, Christine, 1971, *Victorian Attitudes to race*, London Routledge & kegan Paul, Toronto, University of Toronto Press.

Clifford J. & Marcus G. 1990, *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*; Bombay Calcutta Madras, Oxford University Press.

Kottak, Conrad Phillip, 1991, *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*, New York, McGraw Hill, Inc.

Haraway, Donna J. 1988, Remodelling the Human Way of Life: Sherwood Washburn and the New physical Anthropology, 1950-1980, in *History of Anthropology,* Vol. 5. eds. Stocking, G.W. Jr. U.S.A. The University of Wisconsin Press.

Haviland, W. 2000. Cultural Anthropology. Harcourt Brace College Publishers, USA

Marcus G. E. 1999, *Critcal Anthropology Now: Unexpected Contexts, Shifting Constituencies, Changing Agendas*; New Mexico; School of American Research Press.

Marcus G.E. & Fischer M.M.J. 1999, *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*, Chicago & London, The University of Chicago Press.

Nanda, S. 1996. Cultural Anthropology. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company

Randaria, S (unpublished) Through the Prism of Population: State, Modernity and Body politic(s) in India, *Proposal for the AGORA-Project of Wissenschaftkolleg, Berlin.*

Stocking, G. W. Jr. 1988, Bones, Bodies Behavior, in *History of Anthropology,* Vol. 5. Eds. Stocking, G.W. Jr. U.S. A. The University of Wisconsin Press.

Swetlitz, Marc, 1988, The Minds of Beavers and the Minds of Humans: Natural Suggestion, Natural Selection, and Experiment in the Work

of Lewis Henry Morgan, in *History of Anthropology,* Vol. 5. Eds. Stocking, G.W. Jr. U.S.A. The University of Wisconsin Press.

আহমেদ, নিজাম উদ্দিন, ১৯৮২, *পৃথিবীর আদিম সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

আহমদ, রেহনুমা ও চৌদুরী মানস, ২০০৩, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ: সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ।

ইসলাম, এ কে এম আমিনুল, ১৯৮৫, *এই পৃথিবীর মানুষ ১ম খন্ড*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

ইসলাম, মাহমুদা, ১৯৯২, *নৃতত্ত্বের সহজ পাঠ*. ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

সামাদ, এবনে গোলাম, ১৯৯২, *নৃতত্ত্ব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

রহমান, হাবিবুর, ১৯৮৬, *নৃ-বিজ্ঞানের রূপরেখা*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।

বেসেইন, পিয়ের, ১৯৯৭, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, সুফিয়া খাতুন অনূদিত, ঢাকা বাংলা একাডেমী।